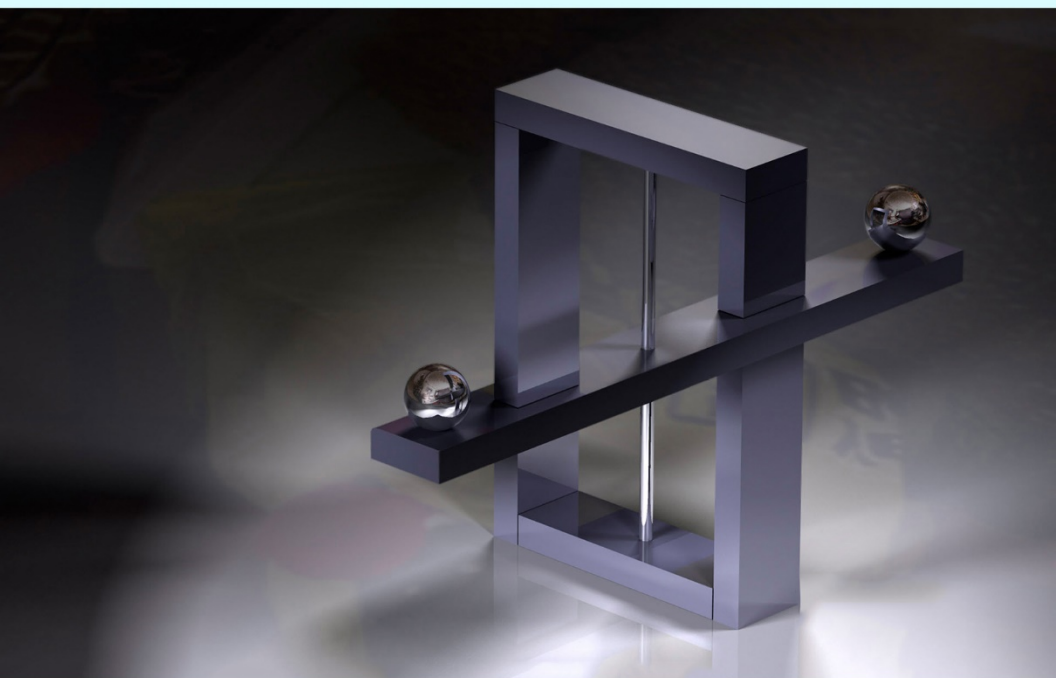


ফিলোসফি

প্রাথমিক ধারণা



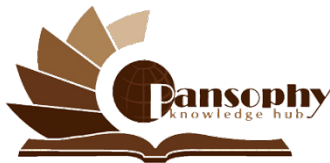
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

ফিলোসফি: প্রাথমিক ধারণা

ফিলোসফি

প্রাথমিক ধারণা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক



ফিলোসফি: প্রাথমিক ধারণা
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৯

প্রকাশনা প্যানসফি

কপিরাইট লেখক

মূল্য ২০০ টাকা

ISBN 978-984-34-7772-9



দক্ষিণ ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১

01953323030

www.facebook.com/pansophy.books

PHILOSOPHY: PRATHOMIK DHARONA by Mohammad Mozammel Hoque; Published by Pansophy, South Campus, Chittagong University, Chittagong; First Edition in November, 2019; Copyright © Author. BDT ৳ 200.

ভূমিকা

Philosophy'র অনুবাদ হিসেবে 'দর্শন' শব্দটি আমার কাছে যুৎসই মনে হয় না। শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার দৃশ্যমান 'পণ্ডিত ধারার' আমি বিরোধী। যে কোনো পরিভাষার ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থকে আমি প্রাধান্য দেয়ার পক্ষপাতি। এ জন্য দেখবেন, আমি 'দর্শনের' পরিবর্তে 'ফিলোসফি' লিখেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

সংকলিত নিবন্ধগুলো বিগত বছরগুলোতে নানা প্রসঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে লেখা। ফিলোসফি প্রফেশনাল হওয়ার পাশাপাশি আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন ফিলোসফি পপুলাইজার। ফিলোসফি আমার কাছে যতটা প্রফেশান তারচেয়ে ঢের বেশি পছন্দ ও আগ্রহের বিষয়।

খেয়াল করে দেখেছি, ফিলোসফি বললে লোকেরা সহজেই কিছু একটা বুঝে ফেলে। কোনো কনসেপ্টচুয়াল ঝামেলায় পড়লে তারা বলে উঠে, 'আরে রাখো তোমার ওসব ফিলোসফি ...'। অথবা বলে, 'দেখো, আমি ওসব ফিলোসফি বুঝি না'। তারমানে, তারা কিন্তু ঠিকই বুঝে নেয়, কোনো বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনার বিষয়গুলো হলো ফিলোসফি।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফিলোসফি চর্চার দিক থেকে এটি হলো অন্টোলজি। অর্থাৎ কোনো কিছুর ব্যাপারে যখন আমরা 'বুঝি না' বলি, তখন আমরা মূলত বুঝাতে চাই, 'বিষয়টি বিষয় হিসেবে ঠিকই আছে। যদিও আমি এটি ততটা ভালো করে বা বিস্তারিতভাবে বুঝি না।' সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একেবারেই যদি সে বিষয়টি না বুঝতো, তাহলে সে বলতে পারতো না, 'না, এটি তো সেটি নয়।' কেননা, কোনো কিছুকে 'নয়' বলার আগে সেটি কীভাবে হয় হয়ে উঠে, তা আগেই জানা থাকতে হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'ঈশ্বর নাই' এ কথাটা অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্য 'ঈশ্বর' সম্পর্কে প্রস্তাবিত দাবি(সমূহ) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। আলোচ্য বিষয় হিসেবে সংশ্লিষ্ট টার্মটি সম্পর্কে যা কিছু দাবি করা হয়, সে সম্পর্কে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যমত্য কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

যেমন, ভূত আছে বা নাই, সে সম্পর্কে আপনি যা-ই মনে করেন না কেন, ভূতের ধারণাটা কিন্তু আপনার, আমার ও সবার কাছে সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

এই দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যায়, সবাই ফিলোসফি বুঝে।

এর উল্টোদিক থেকে বিষয়টিকে দেখলে আমরা বুঝতে পারি, খুব কম লোকই ফিলোসফি বুঝে। এর প্রমাণ হলো, অধিকাংশ লোকই মনে করে, কোনো বিষয়ে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারাটা ফিলোসফারদের মৌলিক ত্রুটি এবং ডিসিপ্লিন হিসাবে এটি ফিলোসফির ব্যর্থতা। অথচ, philosophy is not meant to give any specific answer. But whatever answer you find, that must be philosophical। ফিলোসফিই একমাত্র ডিসিপ্লিন, যা মানুষকে জীবন ও জগতের রহস্য সন্ধানের ব্যাপারে জ্ঞানগতভাবে সক্ষম বা উপযুক্ত মনে করে। ফিলোসফি তাই কোনো বিষয়ে মানুষকে সম্ভাব্য পথ বা উপায়গুলো দেখিয়ে দেয়, যেন সে দিনশেষে নিজেই নিজের পথ বেছে নিতে পারে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেককেই দেখেছি, যারা বিভিন্ন ফিলোসফারের ফিলোসফিক্যাল ক্লেইমগুলো সম্পর্কে অল্প-বিস্তর মুখস্ত বলতে পারেন; এবং এই অর্থে তারা কিছু মাত্রায় ফিলোসফি জানেনও বটে। কিন্তু, ‘ফিলোসফি’ নামক এই জিনিসটা আদতে কী, সেটাই তারা ভালো করে বুঝেননি! এ ধরনের ফিলোসফি প্রফেশনালদের তাই বলতে শোনা যায়, ‘ফিলোসফি পড়ো। কিন্তু ফিলোসফার হওয়ার চেষ্টা করো না।’ কী সাংঘাতিক কথা ...!

সে জন্য আমার ইচ্ছা আছে, ‘philosophy for all’- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার, ফিলোসফি নিয়ে যত ভুল ধারণা আছে সেগুলোকে মিটিয়ে দেয়ার। ইচ্ছা আছে, বাংলাদেশে ফিলোসফিকে একটা ফ্রেডিবল, ডিমান্ডিং এন্ড পপুলার সাবজেক্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার।

ক’দিন পর ১ম বর্ষ বিএ অনার্স স্টুডেন্টদের ভাইভা পরীক্ষা নিবো। গত পরশুদিন তাদের সর্বশেষ লিখিত পরীক্ষায় যে রুমে পরিদর্শনের দায়িত্বপালন করছিলাম সেখানকার একজন স্টুডেন্টকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ফিলোসফিতে তো একবছর পড়লে। বুঝেছো কিছু? বলতে পারবে, ফিলোসফি কী?’ সে বললো, ‘ফিলোসফি হচ্ছে জীবন ও জগত সম্পর্কে জ্ঞান অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা।’ আমি বললাম, ‘এ কেমন আজব কথা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো ডিপার্টমেন্ট আছে নাকি, যেখানে জীবন ও জগতের সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে জ্ঞানের অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছু করা হয়?’ সে আর কিছু বললো না।

তখনি ভাবলাম, পরীক্ষা শেষে ফিলোসফি নিয়ে তাদেরকে কিছু বলবো। সে মোতাবেক পরীক্ষা শেষে তাদেরকে বললাম, ‘ফিলোসফি নিয়ে আমার কিছু লেখা আছে। সেগুলোর লিংক তোমাদের কাছে আমি পাঠাবো। তোমাদের ফেইসবুক গ্রুপে শেয়ার করো। মৌখিক পরীক্ষার আগে সেগুলো পড়ে এসো।’

বাসায় ফিরে আমার গবেষণা সহকারী জনাব মাসউদুল আলমকে ফিলোসফি নিয়ে আমার লেখাগুলোকে একত্রিত করে দিতে বললাম। সে হিসেবে এই সংকলন। এই লেখাগুলো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও আমার ওয়েবসাইটসমূহে ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

আমার অপরাপর গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থটিরও একটা পিডিএফ ভার্সন বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে। ফেইসবুকে ফিলোসফি নিয়ে আমার লেখা ও বক্তব্যগুলোকে পাবেন ‘দর্শন, যুক্তি ও জীবন’ পেইজে। ইউটিউবে আমার সংশ্লিষ্ট ভিডিওগুলো পাবেন ‘যুক্তি ও জীবন’ চ্যানেলে। প্রয়োজনে যে কেউ যে কোনো সময়ে ফিলোসফি সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

এরমানে এই নয়, আমি ফিলোসফির সবকিছু জানি। তবে, ফিলোসফির যে কোনো কিছু জানার আগ্রহ আমার আছে। দীর্ঘদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকার কারণে আপনার আগ্রহের বিষয়ে উপযুক্ত রিসোর্স ও এক্সপার্টের সন্ধান দিতে পারবো, ইনশাআল্লাহ। আর বিষয় যদি আমার ফিল্ডের হয় তাহলে সরাসরি আপনার সাথে এনগেইজ হতে পারবো। আর হ্যাঁ, আমার ফিল্ড অব ইন্টারেস্ট হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা।

এই সংকলনে ফিলোসফির সাথে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু লেখা আছে। ফিলোসফি বুঝার জন্য সেগুলো সহায়ক হবে। জ্ঞানের এই তিনটা ডোমেইন স্বতন্ত্র কিন্তু অপরিহার্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। এর কোনোটিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অন্য কোনোটি শুরুই হতে পারে না। necessary but not identical বলতে যা বুঝায় দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক হলো সেই ধরনের।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পড়ে মূল্যবান পরামর্শ দেয়ার জন্য সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র (সিএসসিএস)-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মাসউদুল আলম ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর পরিচালক জনাব ইব্রাহিম হোসেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার অন্যান্য বইয়ের মতো এই বইটিতেও পাঠকদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো সংযোজন করা হয়েছে। এতে করে বইয়ের কলেবর কিছুটা বেড়ে গেলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ধারণাগত উন্নয়নে এটি সহায়ক হবে বলে মনে করি।

লেখাগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে লিখিত হওয়ার কারণে কিছু পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হবে। একই কারণে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় ও শিরোনাম বিন্যাসের প্রচলিত পদ্ধতি এতে অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। তবুও চেষ্টা করেছি লেখাগুলোর মধ্যে এক ধরনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার।

ফিলোসফির পরিচয়মূলক লেখাগুলোকে প্রথমে, বিজ্ঞানের সাথে ফিলোসফির সম্পর্ক নিয়ে লেখাগুলোকে এরপরে ও ধর্মের সাথে ফিলোসফির সম্পর্ক নিয়ে লিখিত নিবন্ধ ও প্রবন্ধগুলোকে সর্বশেষে সংকলন করা হয়েছে।

ফিলোসফি নামক ডিসিপ্লিনটা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে কোনো ব্যক্তি ফিলোসফির অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে অবচেতন মনে অথচ প্রত্যক্ষভাবে ফিলোসফি চর্চা করার বোকামীতে লিপ্ত হবে না। তাই, উপরেই বলেছি, আমি চাইছি, ফিলোসফির অপেক্ষাকৃত জটিল কোনো তত্ত্ব বোঝা কিংবা বিশেষ কোনো ফিলোসফার বা ফিলোসফিক্যাল স্কুলকে সমর্থন বা খারিজ করার আগে লোকেরা ভালো করে বুঝুক, ফিলোসফি জিনিসটা আসলে কী।

নানাদিক থেকে বইটি আপনাদের কাছে ব্যতিক্রমী মনে হবে। এখানে যা বলা হয়েছে তা কিছুমাত্র নতুন নয়। বাস্তবিক পক্ষে, গ্রীক দর্শনের পরে ফিলোসফির কোনো ধারণাই একেবারে নতুন কিছু নয়। এই অর্থে ফিলোসফিতে কোনো অভিনব কথা বলা অসম্ভব। পরবর্তীকালের বা হালনাগাদের যেসব মত, পথ ও তত্ত্বকে নতুন বলে মনে করা হয় তা আসলে পুরনো কথাগুলোর কোনোটিকে নতুন আঙ্গিকে নতুন করে যুগোপযোগী ভাষায় বলা কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিবেচনা করে বইটির শেষ অংশে দু'টি কবিতা ও আটটি পোস্টার সংযোজন করা হয়েছে।

১৯ নভেম্বর ২০১৯

এস.ই-১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস, চবি

01928672405

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

mozammelhq.com

সূচিপত্র

মাপকাঠির মাপ কী? ফিলোসফি নিয়ে যত সব ভুল বোঝাবুঝি	১১
আন্তর্জাতিক দর্শন দিবসের ভাবনা	১৫
দর্শন বনাম দার্শনিক অবস্থান	২১
ফিলোসফি নিয়েই পড়বো, কিন্তু জানি না চাকরি পাবো কিনা	২৫
জীবন ও জীবিকার পার্থক্য	২৭
ফিলোসফির প্রয়োজনীয়তা	৩১
ফিলোসফি কী?	৩৫
Problem of Defining Philosophy	৩৭
ফিলোসফি বলতে কী বুঝায়?	৩৯
যুক্তি ও আবেগের সম্মিলন	৫৩
বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের দ্বন্দ্ব	৫৫
ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক	৫৯
Science, Philosophy and Religion	৬১
বিজ্ঞানের পরিণতি হলো দর্শন, আর দর্শন শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠে ধর্ম	৬৩
ফিলোসফিক্যাল প্রবলেমকে ডিল করতে গিয়ে সায়েন্টিফিক প্রুফ চাওয়ার সমস্যা	৭৭
পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ ও যুক্তির পার্থক্য	৮১
সায়েন্সের লোকেরা ফিলোসফিকে স্বীকৃতি দিতে চায় না কেন?	৮৩
দর্শন কী? প্রসঙ্গ: দর্শন ও ইসলাম	৯১
ইসলাম ও দর্শন: প্রচলিত ভুল ধারণার সংশোধন	৯৭
জীবন ও জগত সম্পর্কিত কোনো বিষয় ফিলোসফির বাইরে হতে পারে না	১০৭
ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর	১০৯
ফিলোসফিতে পড়ো? তোমাকেই বলছি, শোনো...	১২১
যুক্তির বাইরে কিছু নাই	১২৫
পোস্টার	১২৭

হ্যাঁ, আমি ফিলোসফির স্টুডেন্ট –
এ আমার গর্বের বিষয়
বলার মতো পরিচয়।

মাপকাঠির মাপ কী? ফিলোসফি নিয়ে যত সব ভুল বোঝাবুঝি

ফিলোসফি কোনো বিষয়ে কনক্রিট কিছু একটা দেয়, দেয়ার কথা বা দেয়া উচিত— ফিলোসফি নিয়ে আমার দৃষ্টিতে এর যে কোনোটির চেয়ে বড় ধরনের ভুল বোঝাবুঝি আর হতে পারে না।

দেশের জিডিপিতে ফিলোসফির কোনো অবদান নাই। ফিলোসফাররা একটা কলমও বানায় নাই। বসে বসে খাওয়া ছাড়া তাদের জেনুইন কোনো ‘অবদান’ নাই। এ ধরনের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়।

মানুষের ভেতর থেকে ফিলোসফির তাড়না না থাকলে বানরের একটা প্রজাতি আজকের পর্যায়ে পৌঁছতো না, এ কথা নিশ্চিত। ডারউইনিয়ান বিবর্তনতত্ত্ব সার্বভৌমালের কথা বলে। সুপ্রেমেন্সি করার টেনডেন্সির ব্যাখ্যা দেয় না। মঙ্গল গ্রহে নাসা কর্তৃক নভোযান পাঠানোর মধ্যে নিশ্চয় তেল-গ্যাসের ইজারা পাওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই।

আপনি হয়তো বলবেন, এসব আবিষ্কার ও গবেষণা তো বিজ্ঞানের ব্যাপার। হ্যাঁ, তাই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক হয় কীসের নেশায়? সেটি নিশ্চয় বিজ্ঞান নয়। আনসার ইজ প্লেইন এন্ড সিম্পল, জ্ঞান-গবেষণা-আবিষ্কারের এই নেশারই অপর নাম ফিলোসফি। ফিলোসফি মানে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা love of wisdom। (অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণমূলক) পদ্ধতির কারণে জ্ঞানচর্চা বিশেষ বিজ্ঞান হয়ে উঠে। বৈজ্ঞানিক হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমানুষটার ভেতরগত প্রেরণা বা ‘পাগলামি’টা পিওর ফিলোসফি।

দর্শনের সাথে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার আলোচনা অন্য পর্বের জন্য তোলা রইলো। আপাতত দর্শন ব্যাপারটি বুঝি।

তিন কারণে কোনো কিছু দর্শন হয়ে উঠে। এর প্রথম দুইটি পরিচিতিমূলক ও তৃতীয়টি মূল বৈশিষ্ট্য।

(১) ফিলোসফি কোনো বেসিক ইস্যু অথবা কোয়েশ্চন নিয়ে ডিল করে,

(২) আলোচিত বিষয়ে মুক্ত আলোচনা তথা প্রশ্ন করার অবাধ স্বাধীনতা থাকে,

(৩) পক্ষ-বিপক্ষে যা-ই বলা হোক না কেন, তাতে যুক্তির সমর্থন থাকে।

ফিলোসফি কোনো বিষয়ে একক কোনো কথা বলে না। একক কোনো সমাধানও ফিলোসফি দেয় না। দেয়ার কথাও নয়। দিলে বা কেউ দিয়েছে বলে দাবি করা হলে সেটি ফিলোসফি হিসেবে গণ্য হবে না। ফিলোসফি দেয় আর্গুমেন্ট। ফিলোসফিতে কোনো প্রমাণ নাই। গ্রহণযোগ্য আর্গুমেন্টকে সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য প্রমাণ হিসেবে বলা হয়।

কোনো কিছুর অস্তিত্ব নিয়ে চার ধরনের কথা হতে পারে: আছে, নাই, জানি না অথবা আলোচনাটাই অর্থহীন। ফিলোসফি সবগুলো অপশনের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। দিনশেষে আপনাকেই কোনো একটা অপশনকে বেছে নিতে হবে। এ ছাড়া গত্যন্তর নাই।

তাই, দর্শন গোঁড়ামিমুক্ত হলেও দার্শনিক অবস্থান মাত্রই গোঁড়ামিযুক্ত বা ডগমেটিক। কারণ, যখনই আপনি একটা নির্দিষ্ট অবস্থানকে বেছে নিয়ে অপরাপর সব যুক্তি, সম্ভাব্যতা ও অবস্থানকে কার্যত বাতিল করে দেন, তখন আপনি আর মুক্ত নন। আপনি তখন একটা পক্ষ। আপনার বিবেচনায়, সত্যের পক্ষ।

আবার কোনো পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ থেকে পার পাবেন, এমনটাও হবার নয়। নিরপেক্ষতাও একটা পক্ষ। দুনিয়াটা এক অর্থে দর্শনের কাছে শুরু থেকেই বিক্রীত (sold-out)। কোনো প্রমিনিয়ান্ট ফিলোসফিক্যাল স্কুল এডভোকেসি করে নাই, এমন মত-পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যে পথেই যান না কেন, কোনো না কোনো ফিলোসফির পথেই আপনাকে যেতে হবে।

দর্শনের দরকার নাই। দর্শন মৃত। দর্শন কখনো জেনুইন কোনো বিষয় ছিল না ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি দর্শন বিষয়ে যা-ই বলুন না কেন, তা যদি এ ধরনের চরম নেগেটিভ মন্তব্য বা দাবিও হয়, তাতে দর্শনের বৈধতার ও অপরিহার্যতার কোনো হেরফের হয় না। কারণ, আপনি যা-ই বলুন না কেন, তার পিছনে আপনি যুক্তি দাঁড় করাবেন, ‘প্রমাণ’ দিবেন। যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কথা বলাই হলো আদি, অকৃত্রিম ও নির্ভেজাল দার্শনিক প্রক্রিয়া।

দেখা যাচ্ছে, দর্শনকে ফেলতে ফেলতে, কাটতে কাটতে দর্শন আরো বেড়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন দর্শন তৈরি হয়ে পড়ছে। কী বিপদ! ভাবুন তো, বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আবু হামিদ আল গাযালী দার্শনিকদের ওপর বিরক্ত হয়ে তাদের বাছাই করা ২০টা ভুল কথার ওপর একটা কিতাব লিখলেন। নাম দিলেন ‘দর্শনের খণ্ডন’ (তাহাফাতুল ফালাসিফা)। আর কী মুশকিল, এই বইয়ের জন্য তাঁকেই কিনা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও মুসলমানদের মধ্যে সর্বকালের সবচেয়ে বড় দার্শনিক উপাধি দেয়া হলো!

তাহলে দর্শন থেকে তো রেহাই নাই দেখছি! ভারী বিপদ! আসলেই বিপদ বড় ভারী। রেহাই নাই। এক ধরনের দার্শনিক যুক্তি দিয়ে মানুষ খোদাকে অস্বীকার করে। আবার না দেখা সত্ত্বেও অন্য আরেক ধরনের দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে খোদার প্রতি মানুষ তার বিশ্বাসকে অমোঘ করে তোলে।

দর্শন হলো একটা পদ্ধতি। স্বয়ং কোনো পরিণতি নয়। যে পথে আপনি যেতে চান, দর্শন আপনাকে পথ দেখাবে। পক্ষ, বিপক্ষ বা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের দায় দর্শনের নয়, আপনার। সেটি কৃতিত্বের ব্যাপার হোক বা ভর্ৎসনার কারণ হোক, তাতে দর্শনের কিছু আসে যায় না।

দর্শন সব সময়ে কোনো কিছুই দর্শন। philosophy is always a second-order subject. philosophy is always philosophy of something. এমনকি ফিলোসফিরও ফিলোসফি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাকে মেটা-ফিলোসফি বলা হবে। গুগল সার্চ দিয়ে দেখেন। ফিলোসফি অব ফিলোসফি ধরনের কিছু পান কিনা।

আসলে অর্থপূর্ণ যে কোনো কিছুই ফিলোসফি যদি সেটিকে মো-র থিওরিটিক্যালি দেখা হয়। মাছ যেমন পানিতে ডুবে থাকাকে অনুভব করে না, যেমন করে আমরা বাতাসে ডুবে আছি বলে মনে করি না; তেমন করে দিন-রাত দর্শন চর্চা করেও মানুষ, এমনকি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও অনেকে মনে করে, ফিলোসফি আর তেমন কি! তাদের আক্ষেপ ও অভিযোগ হলো, ফিলোসফি কনক্রিট কিছু দেয় না!

হ্যাঁ, ফিলোসফি কনক্রিট কিছু দেয় না। কত আর দিবে!? এত এত সাবজেক্ট তো সব ফিলোসফি হতেই বের হলো। নাকি, ভুল বললাম? কোনো বিষয় সম্পর্কে ভুল করে হোক, শুদ্ধ করে হোক, যেভাবেই হোক না কেন, কোনো কিছু সম্পর্কে ‘সবাই’ একমত হয়ে গেলে ফিলোসফি তাকে অনতিবিলম্বে আপন সীমানা হতে বের করে দেয়। যেমন করে বড় হওয়ার পর মুরগী ছানাগুলোকে মা-মুরগী ঠুকরিয়ে তাড়িয়ে দেয়। সংশ্লিষ্ট ওই বিষয়ে মতৈক্য পোষণকারীরা জ্ঞানের একটা নতুন ও স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে তখন নিজেদের মতো করে (জ্ঞানচর্চার) সংসার শুরু করে।

বিজ্ঞান হলো ঐক্যমতের বিষয়। দর্শন হলো দ্বিমতের জায়গা। আপনি মেপে মেপে কোনো কিছুর মান সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন। অন্য যে কোনো সাবজেক্টে। যদিও একেক ডিসিপ্লিনে মাপামাপি একেক রকমের। ফিলোসফিতেও মাপামাপি আছে। সে জন্য স্কেলও আছে। পার্থক্য হলো, ফিলোসফিই একমাত্র ডিসিপ্লিন যেখানে মাপামাপির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট স্কেলটাকেও চ্যালেঞ্জ করা যায়, পুরো ব্যাপারটা নিয়েই প্রশ্ন করা যায়। উত্তর থাকুক বা না থাকুক, প্রশ্ন তোলা যায়। অন্তত এমন প্রশ্ন করার অধিকার থাকা তো চাই— মাপকাঠির মাপ কী?

পদার্থ আছে কিনা, এই প্রশ্ন পদার্থবিদ্যায় করা যাবে না। এটি সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। অথচ, ফিলোসফির লেজিটেমিসি নিয়েও আপনি প্রশ্ন তুলতে পারবেন। নো প্রবলেম। যথাসম্ভব যুক্তি খাড়া করে বললে সেটিও দিনশেষে দর্শন চর্চায় অবদান রাখবে, কিংবা হবে নতুন একটা ফিলোসফি।

২০ এপ্রিল, ২০১৬

<https://dorshon.com/misunderstandings-about-philosophy>

আন্তর্জাতিক দর্শন দিবসের ভাবনা

হ্যাঁ, দুনিয়ার অধিকাংশ নামকরা ইউনিভার্সিটিতে ফিলোসফি নামক সাবজেক্টটাই নাই। ইনফেক্ট, দুনিয়ার খুব কম সংখ্যক মানুষই ফিলোসফি নামক সাবজেক্ট নিয়ে পড়েছেন। তাই, পাত্তা পাওয়ার দিক থেকে, উন্নয়ন ও জব মার্কেটে ডিম্যান্ডের দিক থেকে, বলতে পারেন, এটি টোটালি লাপাত্তা এক ‘জিনিস’।

তবে, ফিলোসফি এক আজীব ‘জিনিস’। যাকে খণ্ডন করতে তাকেই লাগে। যাকে বাদ দিতে গেলেও তাকে লাগে। যাকে ফেলে দিয়ে আসলেও, এমনকি কবর দিয়ে আসার পরেও ঘরে এসে দেখতে হয়, আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য সে সেজেগুঁজে হাসিখুশি দিব্যি বসে আছে। কেমন ধরনের এক আশ্চর্য ব্যাপার-স্যাপার!

ফিলোসফি আসলে কী?

এক কথায় বললে, ফিলোসফি হলো যুক্তির খেলা কিংবা ব্যবহার। এর ইনহারেন্ট টেনডেন্সি হলো, মানুষকে ক্রমান্বয়ে জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে ইনভলভ করা।

ফিলোসফি কাউকে স্থির থাকতে দেয় না। সব সময়ে ভাবায়। তবে, ওই যে বললেন, দুনিয়ার অধিকাংশ ‘ভালো-ভালো’ ইউনিভার্সিটিতে ফিলোসফি পড়ায় না। আপনার কথাটা সঠিক।

আপনার কথার সাথে আমি আরও যোগ করছি, খুব কম সংখ্যক মানুষই এই সাবজেক্ট সম্পর্কে সঠিকভাবে জানে। বাস্তবজগতে এ যেন এক অপাংক্তেয় জিনিস। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের শরীরের নানা উপাদান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বাঁচিয়ে রাখে। সেগুলো নিয়ে আমাদের তেমন ভাবনাচিন্তা করা লাগে না। অথচ এগুলোর খানিকটা রস-কষ বাইরে এসে এমনকি আমাদের গায়ে লাগলে আমরা তাড়াতাড়ি সেসব ধুয়ে ফেলি, অস্বস্তি ও অশুচি বোধ করি।

ফিলোসফির প্রতি আমাদের অস্বস্তিবোধও এমন ধরনের ‘অপরিহার্য-অপ্প্ৰ্যতা’র মতো। ফিলোসফি আমাদেরকে ভাবতে বাধ্য করে। যদিও এই অন্তর্গত ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে আমরা সাধারণত সচেতন থাকি না। এর কারণ হলো, আমরা নিজেদের স্বগত ভাবনাগুলোকে স্বীকার করে নিতে ভয় পাই। তাই, ‘ফিলোসফি নিয়ে ভাবি না’ বলে নিজের এই অপরিণীলিত ভাবনাগুলোকে লুকিয়ে রাখতে চাই।

আমরা চোখ দিয়ে দেখি। মাঝে মাঝে আয়নাতে দেখা ছাড়া সেই চোখকে আমরা সরাসরি দেখতে পাই না। এমনকি আয়না দিয়েও যখন দেখি তখন চোখের বাহিরের একটা অবয়বকেই দেখি। তেমনিভাবে জ্ঞানের চোখে আমরা বিশ্বকে দেখি, জানি। যদিও আমাদের এই অন্তর্গত চিন্তাধারার অস্তিত্ব ও গুরুত্বকে আমরা প্রায়শই স্মরণে রাখি না।

হ্যাঁ, আপনার কথাই সঠিক, ফিলোসফি কিছু বানায়নি। দেশের জিডিপিতে ফিলোসফির অবদান শূন্য। উল্টো, দার্শনিকদের পালতে গিয়ে দেশের ঘাটতি-বাজেটের খানিকটা বৃদ্ধি ঘটে। তবে, ফিলোসফি একটা কিছু বানিয়েছে। বিশেষ একটা কাজ সে করেছে। শুনবেন? কিংবা অস্বীকার করবেন?

ফিলোসফি মনুষ্য সদৃশ্য দ্বিপদী একটা প্রাণীকে আজকের এই মানবিক মর্যাদায় উন্নীত করেছে। সোজা কথায়, ফিলোসফির কারণে মানুষ মানুষ হতে পেরেছে। ফিলোসফি কিছু বানায় নাই, কিন্তু সবকিছু বানিয়েছে যে মানুষ, সে মানুষ কিন্তু মানুষ হতে পেরেছে ফিলোসফির কল্যাণে।

ফিলোসফির তাড়নায় মানুষ গুহা হতে বের হয়ে এসে সভ্যতা গড়ে তুলেছে। এক অজ্ঞাত কিন্তু প্রবল অনুসন্ধিৎসা তাকে আজকের এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

হোক প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে, জানতে চাওয়া, সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়া, অপর প্রান্তে কী আছে সেটাও জানতে চাওয়ার এক দুর্নিবার আগ্রহের কারণে মানুষ জ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত হয়েছে। আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছে। নিজের অসীম সম্ভাবনাকে কীভাবে যেন সে বুঝতে পেরেছিল।

তাই তো সে, প্রকৃতিকে তার মতো করে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করেছে। যা ছিলো, যা দেয়া আছে তাকে সে সাধ্যমতো ভেঙে নতুন করে গড়েছে। নিজের সামর্থ্যকে সে প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে নিয়েছে। আপন স্বপ্নকে সে প্রতিনিয়ত সাজিয়ে রেখে গেছে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

কেন জানি প্রথম থেকেই সে কোনো এক অন্তর্গত প্রেরণায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার, আরো বড় হওয়ার, সীমাহীন অনিশ্চিত গন্তব্যে এগিয়ে যাওয়ার, নিজের ‘ন্যাচারাল

হেবিটেটকে' ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কেন তার এ তাড়না? কিসের থেকে আসে তার এই অন্তহীন প্রেরণা? এসব সে নিজেই সঠিক জানে না। শুধু জানে, এগিয়ে যেতে হবে। এ যেন দিগন্ত ছোঁয়ার এক কৈশোরিক পাগলামো।

নিছক বিবর্তনতত্ত্ব দিয়ে আপনি এটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। যদিও এর একটি বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা আছে, কিংবা হতে পারে। বিবর্তনতত্ত্বও তত্ত্ব হিসেবে অপরাপর তত্ত্বগুলোর মতো একটা ফিলোসফিক্যাল থিওরি বটে। প্রাণিবিদ্যার বিবর্তন তত্ত্ব আর ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে পড়ানো বিবর্তন তত্ত্ব এক জিনিস নয়। যেমন করে মেথোডলজিক্যাল অর সায়েন্টিফিক ন্যাচারালিজম এবং ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম এক জিনিস নয়।

আজ শুধু এটুকুই বলবো, নিছক ধারণার বলেই, পাওয়ার অব আইডিয়ার ওপর ভর করেই, নিজের যা কিছু অর্জন, তার সবকিছু নিয়েই 'মানুষ' আজকের এই সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে সভ্যতাগত তাবৎ ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষই শুধু সভ্যতা গড়ে তুলেছে। প্রজাতি হিসেবে মানুষই শুধু সভ্য হতে পেরেছে। অন্য কোনো প্রাণী পারে নাই। কেন পারে নাই? কারণ, তাদের জীবন আছে বটে। বেঁচে থাকার তাড়নাও আছে। কিন্তু নাই কিংবা গড়ে ওঠে নাই তাদের বৃহত্তর জীবনবোধ। ফিলোসফি হলো এই মানবিক জীবনবোধের অপর নাম।

ফিলোসফির পাল্লায় পড়ে, জ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য তাড়নায়, যুক্তির শক্ত টানে কিংবা প্রচণ্ড চাপের অনিবার্য পরিণতিতে সে সেরা প্রাণী হিসেবে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে যুগপৎভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কায়ম করেছে।

মানুষের এই শুদ্ধ পরিচয় ও এই অন্তর্গত প্রেরণা এসেছে ফিলোসফি থেকে। যে কোনো সাবজেক্টের গুরুত্ব এবং শেষের দিকের মৌলিক ইস্যুগুলো নিয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে এটি কাজ করে। কারো স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির পরোয়া করে না। এ এক অনিরুদ্ধ গতি। এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

আর্গুমেন্টই হলো ফিলোসফির একমাত্র সম্বল। যুক্তির এই হাতিয়ারকে ব্যবহার করে সে হতে পারে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Faisal Tariq: “হ্যাঁ, দুনিয়ার অধিকাংশ নামকরা যুনিভার্সিটিতে ফিলোসফি নামক সাবজেক্ট নাই।”

The reality is quite opposite. Philosophy is taught/researched only in well-established and reputed universities.

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: A biochemistry teacher with a PhD from Japan has said it to me.

Faisal Tariq: During my PhD, I worked both in the UK and in Japan and aware of the 'PhD culture' in both places. So, I probably do understand why he made such comments. But I do not blame him really. We grew up in an environment where any domain except Engineering and Medicine are brushed aside.

I had the same feeling towards arts and social sciences disciplines until I started my PhD. We were exposed to the research aspects of different domains (particularly arts and social science) for the first time and we learned to appreciate the necessity of all disciplines for the advancement of human civilisation.

Borhan Ahmed: খুব কঠিন একটা সাবজেক্ট এই ফিলোসফি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: নারিকেলের মতো।

Sarwar Kamal: আমিও গতকাল ছাত্রদের নারিকেলের উদাহরণ দিয়ে দর্শনের তরল মতবাদ হতে ঘনীভূত হওয়া, কঠিন হওয়া এবং নিরস হওয়ার বিষয়টি বোঝালাম।

Borhan Ahmed: নারিকেলের সাথে কী রিলেশন দর্শনের?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: নারিকেলের বাহিরটা শক্ত হলেও ভিতরটা নরম ও সুস্বাদু। তেমন করে ফিলোসফি আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হলেও আসলে তা বেশ সহজ ও আকর্ষণীয়।

Sarwar Kamal: সক্রান্তে পর্যন্ত দর্শন ছিলো তরল আকারের, যার স্থির রূপ ছিলো না। প্লাতো-আরিস্তোতলের পর্যায়ে এসে গ্রীক দর্শনের একটি সুনির্দিষ্ট স্থির রূপ দাঁড়ায়। যুরোপীয় দর্শনের মধ্যে এখনো সবচেয়ে উপাদেয় দর্শন হলো প্লাতো-আরিস্তোতলের দর্শন। তারপর আধুনিক কালে

কান্ট আর হেগেল হলেন সেই নারকেলের মালা, অতি শক্ত। মার্ক্স থেকে শুরু করে পরের দর্শন হলো নারিকেলের পুরো খোসা, যার পরিমাণ বেশি, নিরস, অতৃপ্তিকর। এখন দর্শনের মূল মজা পেতে গেলে নারিকেল আর পানি খেতে হবে, বিমূর্ত সত্তা বিষয়ক চিন্তার স্তরে পৌঁছতে হবে। আর তা করতে গেলে সমসাময়িক দর্শন পড়ে নারিকেলের খোসা ছাড়াতে হবে, এরপর কান্ট ও হেগেলের দর্শন পড়ে নারকেলদর্শনের শক্ত মালাটা ফাটতে হবে। তারপর দর্শনের স্বাদ পাওয়া যাবে।

Khondoker Zakaria Ahmed: ধন্যবাদ, সুন্দর লেখার জন্য। ফিলোসফি ব্যতীত মানুষ অচল। ফিলোসফিই মানুষকে উন্নয়নের পথ দেখায়। ফিলোসফি মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করে। মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার চিন্তা, গবেষণা, যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর, যা করতে ফিলোসফি সাহায্য করে। এটি কঠিন বিষয় কিনা জানি না। তবে এখন যদি আমাকে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আমি ফিলোসফি পড়তাম।

Gazi Nazrul Islam: প্রত্যেক মানুষের জীবনে বাস্তব ফিলোসফি বা দর্শন রয়েছে। মানব জীবনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা এবং সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তার বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, গবেষণা, যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর গড়ে উঠে বাস্তব জীবন দর্শন। যাদের বিশ্বাস ও টার্গেট অনন্ত জীবনের কল্যাণ, তাদের কাছে বাস্তব ফিলোসফি এক ধরনের। আর যাদের বিশ্বাস ও টার্গেট দুনিয়ার জীবনের ভোগ বিলাস, তাদের কাছে স্তব জীবন দর্শন অন্য ধরনের। বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করে তাত্ত্বিক ফিলোসফির মাঝে কোনো কল্যাণ নাই।

Masuk Pathan: এবং ফিলোসফির যুক্তিই তাকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে দেয়নি। কারণ, যুক্তি তো ঈশ্বরের আরেক সৃষ্টি সময়কে অতিক্রম করতে পারে না। কাজেই ফিলোসফি জীবনের অমিত সম্ভাবনা জাগরুক দুঃসাহসী হাতিয়ার হয়ে জ্ঞানের রাজ্যে দাপটে চলুক এবং আপন সীমানাটা বুঝে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হোক।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তা ফিলোসফি হবে। নাস্তিকতার মতো আস্তিকতাও ফিলোসফিরই অন্যতম তত্ত্ব। বিশ্বাসী এই তত্ত্বকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে।

Mahmudur Rahman: I don't know how it sounds as doctor of philosophy in philosophy. But all doctorates, except medicine, exercise philosophy to some extent. But those are mostly based on facts (at least from the perspective of science background).

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: কোনো ডিসিপ্লিনের শুরুর আগে আর শেষের পরে যেসব জিনিস থাকে, ফিলোসফি সেসব নিয়ে এনগেজ হয়। তখন তাকে ওই সাবজেক্টের দর্শন বলা হবে। philosophy is always philosophy of something. It's a second-order discipline. That means, it starts by taking the concerned disciplines whatever findings as granted. But proceeds to inquire the potential inconsistencies there. Philosophy not only finds the flaws; it also proposes the alternatives.

১৮ নভেম্বর ২০১৬

<https://dorshon.com/some-thoughts-on-international-philosophy-day>

দর্শন বনাম দার্শনিক অবস্থান

ফেইসবুকে একজনের স্ট্যাটাস: “দর্শনে ‘আল্লাহ’ খোঁজলে ‘নাই’ পাইবেন। তখন আপনার নাস্তিক হতেই হবে। না হইলে আপনার মধ্যে সততা নাই।”

আমার মন্তব্য: “এমন অদ্ভুত অবাস্তব কথা গত তিরিশ বছরের দর্শন চর্চায় পাই নাই।”

তিনি এর উত্তর দিলেন: “না পাইলে সেই দায়িত্ব নিশ্চই আমি নেব না।”

আমার প্রতিমন্তব্য: “দর্শন সম্পর্কে আপনার প্রাথমিক জ্ঞান-ই নাই। দেখছি।”

১.

হ্যাঁ, দর্শন বা ফিলোসফি সম্পর্কে একটা সাধারণ ভুল ধারণা হলো, অন্যান্য জ্ঞানশাখার মতো এটি কোনো বিষয়ে ‘একটা কিছু’ বা ‘প্রধান একটা কিছু’ বলে।

না, ফিলোসফি কোনো কিছু সম্পর্কে তেমন কিছু বলে না। বরং, কোনো বিষয়ে অপশন বা সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তিগুলো তুলে ধরে। দিনশেষে ব্যক্তি নিজ সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করে। এই অর্থে, philosophy is not prescriptive, but descriptive.

ফিলোসফি আর ফিলোসফিক্যাল– এই দুইটা নোশনকে স্বতন্ত্রভাবে বুঝতে হবে।

দর্শন, বাই ডেফিনেশান মুক্ত, অব্যবহৃত। দার্শনিক বলতে যা বুঝায়, তা এর বিপরীত।

কোনো ব্যক্তি-দার্শনিক বা নির্দিষ্ট কোনো দার্শনিক অবস্থান কোথাও না কোথাও স্থিত। এর অন্যথা অসম্ভব।

উদাহরণ হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়। এটি আন্তিকতা, নাস্তিকতা, সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়তাবাদ কিংবা নির্বিকারবাদের (irrelevantism) যে কোনোটিই হতে পারে। স্বতন্ত্রভাবে এর প্রতিটাই ইকুয়ালি ফিলোসফিক্যাল।

আব্রাহাম আছেন বলে যিনি মনে করেন তিনি আন্তিক। নাই মনে করলে তিনি নাস্তিক। আছে বা নাই- কোনোটাতেই নিশ্চিত নন যিনি, তিনি সন্দেহবাদী। ব্যাপার এতই জটিল যে তা মানবীয় বোধজ্ঞানের বাইরে- কেউ এমন মনে করলে তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী। কেউ যদি ইস্যুটোকেই অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন, তাহলে তিনি মুক্তমনা (free thinker) বা নির্বিকারবাদী।

বিপক্ষ যুক্তিকে ‘কু-যুক্তি’ হিসেবে আপনি যত গালিই দিন না কেন, এই পক্ষগুলোর প্রত্যেকটির পক্ষেই যুক্তি আছে।

প্রচলিত ধারণা মতে, যাচাই করার ব্যাপারটা হলো যুক্তি থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কিত। এটি ভুল। বরং সঠিক কথা হলো, যুক্তি দুর্বল বা শক্তিশালী কিংবা ‘গ্রহণযোগ্য’ মনে হওয়া। দর্শনের কাছে তাই সব যুক্তি-পক্ষই সমান। প্রত্যেক মত-পথই স্বতন্ত্র দার্শনিক অবস্থান।

ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমরা স্থায়ী জীবনবোধের (paradigm অর্থে) আলোকে inference to the best explanation (IBE)-এর ভিত্তিতে যার যার মতো করে ‘সত্য’কে খুঁজে পাই। নিজের বিশ্বদৃষ্টির আলোকে মতাদর্শ বিশেষকে আমরা সঠিক হিসেবে গ্রহণ করি।

মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক সত্যই ‘গৃহীত সত্য’। সেটি ভুল কিবা সঠিক, তা ভিন্ন বিবেচনা। এবং বিবেচনারও কোনো একক মানদণ্ড নাই।

তারমানে, সার্বজনীন কোনো সত্যতা বা মানদণ্ড নাই, এমন নয়। সার্বজনীনকে ব্যক্তিবিশেষ গ্রহণ করার মাধ্যমে তা (ব্যক্তির কাছে) সার্বজনীন হয়ে উঠে।

ব্যক্তি মানুষ হিসেবে ইউনিভার্সাল বা সার্টেইন ট্রুথকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা ইউনিভার্সেলিটি বা সার্টেইনিটির সাথে যুক্ত হই। হেগেল একে objective idealism বা বস্তুগত ভাববাদ হিসেবে বলেছেন।

এর বিপরীতে পোস্ট-মডার্নিজমের কথা হলো, আসলে বিশ্বজনীন বা চিরন্তন সত্য বলে কিছু নাই। সব কিছুই আপেক্ষিক। ইসলামের দৃষ্টিতে, বুঝতেই পারছেন, দার্শনিক উত্তরাধুনিকতা অগ্রহণযোগ্য। ভুল।

এটুকু কেউ বুঝতে না পারলে তার পক্ষে ফিলোসফি নিয়ে অধিকতর এনগেজ হওয়াটা নিছক রিসোর্সের অপচয়। এবং ক্ষতিকরও বটে।

দর্শনে কোনো ‘প্রমাণ’-এর কারবার নাই। এভিডেন্সকে এখানে আর্গুমেন্ট হিসেবে হাজির করা হয়। যার যার মতো করে ‘যুক্তিসংগত’ মতকে ব্যক্তি হিসেবে আমরা ‘প্রমাণ’ বিবেচনা করে বিশ্বাস বা গ্রহণ করি।

এর বাইরে অর্থাৎ এই কথাগুলোর বিপক্ষে ফিলোসফি সম্পর্কে কেউ কিছু জানলে, দয়া করে বলুন। আশা করি, যা কিছু বলবেন, বুঝে-শুনে বলবেন।

২.

ইসলামিক স্কলাররা ফিলোসফির বিরোধিতা করেছেন, ব্যাপক সংখ্যায়। এটি তখনকার সময়ের ব্যাপার। এখন যা চলছে তা কন্টিনিউটি মাত্র। সুতরাং, ইসলাম বনাম ফালসাফার মধ্যযুগীয় বিরোধটা ঐতিহাসিক, contextualized।

দর্শনের বিরোধিতা করে যা বলা হয়েছে বা করা হয়েছে তাও আদতে দর্শনই বটে। তৎকালীন দার্শনিকদের বিরুদ্ধে লেখা আবু হামিদ আল গায়ালির “তাহাফাতুল ফালাসিফা” বলুন আর হাল নাগাদের স্টিফেন হকিংয়ের “দ্যা গ্রান্ড ডিজাইন”-এর কথাই বলুন, চরম আস্তিক আর চরম নাস্তিক উভয় পক্ষসহ সব পক্ষের জন্য দর্শনের এই অপরিহার্যতা ও অনিবার্যতা অলংঘনীয়।

দর্শনকে খণ্ডন করার জন্য দর্শনই লাগবে। দর্শনে আপনি সবই পাবেন। দর্শনের মেশিনের ভেতর দিয়ে আপনি যা ইচ্ছা তাই বানাতে পারবেন। শর্ত হলো, যাই করেন না কেন, যুক্তি লাগবে। মুখস্ত কথায় কাজ হবে না।

এখানে অন্ধ বিশ্বাসের জায়গা নাই। যদিও, জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিতে, সব জ্ঞানই সত্যতা ও যাচাইযোগ্যতার সমর্থনপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট ধরনের বিশ্বাস। হতে পারে সেটি empirical belief, rational belief অথবা intuitive belief।

নাস্তিকরা, দেখেছি, এই ধরনের কথাবার্তা শুনে চমকে উঠেন। দর্শনের অন্যতম মৌলিক শাখা হিসেবে জ্ঞানতত্ত্বে বিশ্বাসের এত ছড়াছড়ি ও খবরদারী দেখে তারা চরম অস্বস্তিতে ভোগেন।

আবার, আস্তিকদেরও কাউকে কাউকে দর্শন না বুঝেই একে ‘খারিজ’ করার জোশে উদ্বাহ হয়ে ছুটেতে দেখি। অথচ, দর্শনই হতে পারে, নাস্তিকতা ঠেকানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার!

ভাবছি, পাবলিকলি ফিলোসফির কোর্স করানো শুরু করবো কিনা...

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Noman Saifullah: কতিপয় ঈমানদার এসব ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। আপনাকে ধন্যবাদ বিষয়টি আবারও তুলে ধরার জন্য। আসলে বর্তমানে কতিপয় মুমিনের অবস্থা এমন যে সবকিছুর বিরোধিতা বিশেষত দর্শন চর্চার বিরোধিতাকে ইসলাম বলে মনে করেন। ভারী আজব ব্যাপার!!!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হ্যাঁ, তাই তো।

তদুপরি, কিছু ধর্মনিষ্ঠ অতি সরল ব্যক্তি আসলেই ‘প্রতিক্রিয়াশীল’। তাদের বিরোধী পক্ষ যাই বলে, তারা চেষ্টা করে, সেটাকে অবমূল্যায়ন করার। যেন বিরোধিতাই হক্ক প্রতিষ্ঠার পথ। সত্যের প্রতিষ্ঠা একটা স্বয়ং ইতিবাচক ব্যাপার। তাই, বিরোধিতা নয়, প্রস্তাবনাই হলো ফোকাসড। বিরোধিতাটা সাময়িক, প্রস্তাবনাটা স্থায়ী।

ইসলামপন্থীরা এই ইনকুসিভ মেথডলজিকে প্রায়শই ভুলে যান। ব্যাপারটা দুঃখজনক। আমাদের উচিত, ইতিবাচক মন-মানসিকতা নিয়ে জগত ও জীবনকে দেখা। মাথার মধ্যে খালি ফ্যান্টাসি ঘুরলে এ রকম উল্টাপাল্টা চিন্তায় হাবুডুবু খেতে হবে।

নাস্তিকরা ফিলোসফির দোহাই দেয়। তাই, ফিলোসফি খারাপ! তো, নাস্তিকরা তো মানবতাবাদের কথাও বলে। বস্তুত, মানবতাবাদ হলো নাস্তিকতার ইতিবাচক প্রস্তাবনা। ধর্ম, ঈশ্বর ও ধর্মগ্রন্থের বিকল্প হিসেবে। তাহলে, ধার্মিকরা কি মানবতাবাদের বিরোধিতা করবেন? কী আশ্চর্য!

১৯ জানুয়ারি, ২০১৭

<https://dorshon.com/philosophy-versus-philosophical>

ফিলোসফি নিয়েই পড়বো, কিন্তু জানি না চাকরি পাবো কিনা

[এক তরুণের সাথে মেসেঞ্জারে আলাপ]

“আমার ফিলোসফি খুব ভালো লাগে। আমি নিয়মিত আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলো পড়ি। দর্শন নিয়ে পড়তে চাই। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না। দর্শন ভালো লাগে। কিন্তু এটা নিয়ে আমি কি কোনো ক্যারিয়ার করতে পারবো? আমি এখন দশম শ্রেণীতে পড়ি এবং পরীক্ষা দিচ্ছি। যদি বলেন তাহলে আমার অনেক উপকার হতো।”

কিছু চাকরি আছে যেগুলো নির্দিষ্ট পেশার বাইরের কেউ করতে পারে না। যেমন—ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি। আবার কিছু চাকরি আছে যেগুলোতে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে পড়াশোনা থাকতে হয়। যেমন ফার্মাসিউটিক্যালস ল্যাবে কাজ করার জন্য কেমিস্ট্রি বা বায়োকেমিস্ট্রি পড়া লাগে।

এভাবে বিশেষায়িত পেশায় কর্মসংস্থানের সুযোগ, আমার ধারণায়, বড়জোর শতকরা ৩০ ভাগ চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চাকরি বাজারের অবশিষ্ট বেশিরভাগ জব যে কোনো সাবজেক্ট পড়েই করা যায়। প্রয়োজন হলো স্মার্টনেস, অ্যানালাইটিক পাওয়ার, ক্রিটিক্যাল থিংকিং, কমিউনিকেশন স্কিল, ইনকুসিভনেস ইত্যাদি। এই মানবিক গুণগুলো অর্জনের জন্য যে সাবজেক্টটা সবচেয়ে বেশি উপযোগী তা হলো ফিলোসফি। ফিলোসফি পড়ানোর যে পদ্ধতি আমাদের এখানে ফলো করা হয় তা ক্রটিপূর্ণ। এ কথা সত্যি। কিন্তু এই ধরনের সমস্যা আমাদের এখানকার অন্যান্য তথাকথিত ভালো সাবজেক্টগুলোর জন্যও প্রযোজ্য।

ওইসব তথাকথিত ভালো সাবজেক্টে যেই মানের স্টুডেন্ট ভর্তি হয় আমরা যদি সেই মানের স্টুডেন্ট পেতাম, তাহলে হয়তোবা আমাদের ডিপার্টমেন্টে পড়ালেখার মান আরো অনেক ভালো করা যেত। বিগত কয়েক বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

যারা বিসিএসে বেশি টিকেছে তাদের মধ্যে ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের অবস্থান প্রথম দিকেই।

সবশেষে আমি যে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চাই তা হলো, জীবন তো শুধু ক্যারিয়ার গড়ার ব্যাপার নয়। জীবন কী? ক্যারিয়ার কেন? এ ধরনের মৌলিক যে কোনো প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য যে কাউকে আসতে হবে ফিলোসফির ডোমেইনে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফিলোসফি পড়াশোনা করুন কিংবা না করুন, তাতে কিছু আসে যায় না। ‘ফিলোসফির দরকার নাই’- এই কথাটাও কাউকে বলতে হয় ফিলোসফিক্যালি তথা যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে।

ফিলোসফি ছিল আমার ফাস্ট এন্ড ফোরমোস্ট চয়েস। যদিও আমি মেট্রিক-ইন্টার সায়েন্স নিয়ে পড়েছি। তখনকার সময়ে দুটোতেই ছিল ফাস্ট ডিভিশন। আমি অন্য কোথাও ভর্তির কোনো চেষ্টাই করিনি। আমি মনে করি, জীবনের এই সিদ্ধান্তটিতে আমি একেবারেই সঠিক ছিলাম। যারা আদর্শবাদী, যারা চিন্তাশীল, ফিলোসফি হওয়া উচিত তাদের প্রথম অথবা প্রধান চয়েস।

“ধন্যবাদ স্যার সময় দেওয়ার জন্য। আমি ফিলোসফি নিয়েই পড়বো। জানি না কেন। কিন্তু এইটাই ভালো লাগে। আমি জানি না চাকরি পাবো কিনা। কিন্তু এটা নিয়েই পড়বো। দোয়া করবেন।”

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

<https://dorshon.com/why-you-should-study-philosophy>

জীবন ও জীবিকার পার্থক্য

এলাকার সব বাচ্চারা আমার বাসায় খেলতে আসে। বিকেল বেলা। নিয়মিত। সেরকম একটা মেয়ে শিশু। ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ে। সে আমাকে বললো, তার এইম ইন লাইফ হচ্ছে ডাক্তার হওয়া। বিশেষ করে, সে সার্জন হতে চায়। সেখানে আমার ছোট মেয়ে আর তার একজন বান্ধবী ছিল। ওরা ক্লাস নাইনে পড়ে। ক্লাস সেভেনে পড়ুয়া একটা মেয়েও সেখানে ছিল। সেভেনে পড়ুয়া মেয়েটিকে অ্যাড্রেস করে সবার উদ্দেশ্যে আমি এ ধরনের কিছু কথাবার্তা বললাম:

দেখো, রুহানার এইম ইন লাইফ হচ্ছে একজন সার্জন হওয়া। আমরা আশা করতে পারি তার বয়স যখন ২৫/২৬/২৭ হবে, অর্থাৎ ইন হার মিড টুয়েন্টিজের দিকে ও একজন সার্জন হয়ে যাবে। এতে করে তার জীবনের লক্ষ্য পূরণ হয়ে যাবে। তাহলে কি আমরা ধরে নেবো, তার বাদবাকি জীবনের কোনো লক্ষ্য থাকবে না? মিনিং থাকবে না?

তারা বলল, ডাক্তার হয়ে যাওয়ার পরও তার জীবনের লক্ষ্য বা তাৎপর্য, মিনিং অব লাইফ বলতে আমরা যা বুঝি, সেগুলো থাকবে। না হলে সে বেঁচে থাকবে কেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই তো। মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তাৎপর্য তথা মিনিং বলতে আমরা যা কিছু বুঝে থাকি সেগুলো আছে বলেই তো মানুষ বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকার প্রেরণা পায়। তাই যদি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, সরকারি কর্মকর্তা বা ব্যবসায়ী হওয়াটা কারো জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। এটি হতে পারে কারো জীবিকার লক্ষ্য বা choice of profession।

মেয়েদের বললাম- তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো, জীবিকার লক্ষ্য আর জীবনের লক্ষ্য কিন্তু এক নয়।

এ পর্যায়ে আমার মেয়েটা বলে উঠলো- তাহলে আমাদের বইগুলোতে ‘what is your aim in life?’ হিসেবে যে প্রশ্ন করা হয় বা যা বলা আছে, সেগুলো কি ভুল?

আমি বললাম- তোমরাই বলো, কারো আয়-উপার্জনের বিষয়টিকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বলাটা সঠিক কিনা? তোমাদের যুক্তি কী বলে? বইয়ের কথা বাদ দাও। আমার কথাও বাদ দাও। তোমাদের কাছে কোনটা সঠিক মনে হয়, সেটাই তোমরা বলো।

তারা সবাই একটুখানি চিন্তা করল এবং বলল- জীবিকার লক্ষ্য এবং জীবনের লক্ষ্য আসলে এক নয়। বইগুলোতে যেটা লেখা আছে সেটা ভুল।

তখন তাদেরকে আমি বললাম- দেখো, এই যে যুক্তি দিয়ে তোমাদেরকে একটা কথা আমি বুঝালাম, এটাই হচ্ছে ফিলোসফি। তোমাদের ‘মোজাম্মেল চাচা’ এই সাবজেক্টটাই পড়ান। ক্লাস নাইন আর সেভেনে পড়ুয়া মেয়ে দুটির বাবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের টিচার। সেই সুবাদে তাদেরকে বললাম-

দেখো, জিওগ্রাফি পড়া দরকার। কিন্তু তারচেয়েও বেশি দরকার ফিলোসফি সম্পর্কে জানা। যে যেই সাবজেক্টেই পড়ুক না কেন, জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে তার যদি কিছু জানতে হয়, তাহলে তাকে সেটা কোনো না কোনো যুক্তি দিয়েই ঠিক করতে হবে। আর বলাই বাহুল্য, জীবনের লক্ষ্য বা এ ধরনের কোনো মৌলিক বিষয়ে যুক্তি দিয়ে কিছু বলাটাই হচ্ছে ফিলোসফি।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Nil Hansel: বর্তমানে যুক্তি দিয়ে জীবন চলে না, জীবন চলে জীবিকা দিয়ে। ফিলোসফির ভাষায় কী বলে?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: এটাও তো একটা যুক্তি বটে। এর মানে হলো আমরা শেষ পর্যন্ত কিন্তু যুক্তি থেকে বের হতে পারলাম না। তার মানে হলো, ‘ফিলোসফির দরকার নাই’ এই কথাটা বলার জন্যও ফিলোসফিক্যাল আর্গুমেন্টেটিভ প্রসেসে যেতে হয়। কী অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?

‘জীবন চলে জীবিকা দিয়ে’- এটি অত্যন্ত স্থূল একটি কথা। এই কথার মতো যে কেউ বলতে পারেন, ‘পেট ঠিক তো মাথা ঠিক’। আমরা সবাই একমত হবো যে পেট খালি থাকলে মাথা কাজ করে না। কিন্তু এর মানে এই নয়, পেট এবং মাথা দুটো একই জিনিস বা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অথবা আমরা এটাও মনে করব না যে, মাথার চেয়ে পেটের গুরুত্ব বেশি। অথবা আমরা এটাও মনে করব না, কারো উদর তার মস্তিষ্কে পরিচালনা করে। যদিও সেটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ

যখন কারো প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকবে সেটা তার মন-মানসিকতাকে প্রভাবিত করে বা করতেই পারে।

কিন্তু এর থেকে যদি কেউ এই অনুমান করে যে মানুষের জৈববৃত্তি তার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালনা করে, তাহলে সে ভুল করবে। কেননা, আমরা জানি, মানুষের জৈববৃত্তি কখনো কখনো তার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রভাবিত করলেও মানুষ মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সে জৈবিক এবং অপরাপর যে কোনো ফ্যাকাল্টিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

এভাবে আমরা জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে বলতে পারি, জীবনের জন্য জীবিকা গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু জীবন ও জীবিকা দুটি আলাদা জিনিস। they are necessarily connected, but not identical entities. জীবিকার জন্য জীবন নয়। বরং জীবনের জন্য জীবিকা। যদিও আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যাপারটা চলছে উল্টো রকমে। সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ।

৯ নভেম্বর, ২০১৮

<https://dorshon.com/difference-between-life-and-profession>

যুক্তির বাইরে কিছু নাই
বুদ্ধির অনুকূলে আমরা সর্বদা

ফিলোসফির প্রয়োজনীয়তা

Everyone does philosophy. But only a few are aware of doing it.

প্রত্যেকে ফিলোসফি চর্চা করে। কিন্তু খুব কম লোকই সেটি সচেতনভাবে বুঝতে পারে। বাতাসের মধ্যে আমরা সব সময় ডুবে থাকি। কিন্তু খুব একটা সচেতনভাবে আমরা তা অনুভব করি না। ঘাটতি পড়লেই শুধুমাত্র বুঝতে পারি।

আমরা ফিজিক্সের নিয়ম অনুসারে হাঁটহাঁটি করি বা সাঁতার কাটি বা যে কোনো ধরনের মুভমেন্ট করি। অবচেতনভাবেই আমরা পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো মেনে চলি। পদার্থবিদ্যাবিদ হলেন তিনি যিনি নিয়মগুলো সচেতনভাবে অন্য অনেকের চেয়ে বেশি জানেন, অধিকতর বুঝতে পারেন এবং আরো ভালোভাবে জানার চেষ্টা করেন।

মানুষ মাত্রই জন্মগতভাবে একেকজন ফিলোসফার। যখনই মানুষ কোনো যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখনই ফিলোসফি করে। এমনকি কেউ যখন কোনো ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখনো সে ফিলোসফি চর্চা করে। কেননা, এই ভুল সিদ্ধান্তটি সে কোনো না কোনো কারণেই গ্রহণ করেছে।

সোজা কথায়,

(১) যার অটোনিমি আছে,

(২) বিদ্যমান বা প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে কেউ যখন একটা কিছুকে বেছে নেয়,

(৩) এটি যখন সে ইনহারেন্ট সাবজেক্টিভিটি বা ইন্টেনশনালিটি তথা নিয়তের ভিত্তিতে করে,

তখন তার এই কাজটি হয় একটি নৈতিক ক্রিয়া। তাই সেটি ডুইং ফিলোসফি হিসেবে বিবেচিত হবে।

বলা বাহুল্য, শুধুমাত্র মানুষেরই আছে নৈতিকতা, নৈতিক দায়বোধ ও সার্বিকভাবে বিবেচনা করার ক্ষমতা। শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞানই হলো তথ্যের চেয়েও অধিকতর কিছু। কোনো সচেতন ব্যক্তিসত্তা যখন প্রাপ্ত তথ্যের সাথে স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গি বা নরম্যাটিভ ভালু সংযোজন করে তখনই তথ্যগুলো জ্ঞান হয়ে ওঠে।

এবার বলেন, এই কাজগুলো মানুষের মধ্যে কে না করে?

তার মানে, ওই যে শুরুতে বললাম, মানুষ যে চিন্তা করে সচেতনভাবে হোক কিংবা অবচেতনে, অবশ্যই তা ফিলোসফিক্যালিই করে থাকে। এটি করতে সে গঠনগতভাবেই বাধ্য।

যদিও পেশাগতভাবে হোক বা না হোক, যারা ফিলোসফি চর্চা করে তারা ছাড়া অন্যরা নিজেদের এই স্বগত বা intrinsic দার্শনিক চরিত্র সম্পর্কে সচেতন থাকে না।

এ সম্পর্কে আরও জানার জন্য এই ভিডিওটি দেখতে পারেন:

<https://www.youtube.com/watch?v=gqyDlHlom1U>

[স্মার্টফোনে ভিডিওটি দেখতে পাশের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন]



মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Md. Rakibul Hasan: “মানুষ মাত্রই জন্মগতভাবে একেকজন ফিলোসফার। যখনই মানুষ কোনো যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখনই ফিলোসফি করে।” এ বাক্য দুটির ওপর ভিত্তি করে আমার কিছু প্রশ্ন:

১. যুক্তি দিয়ে কাজ করলেই কি দর্শন চর্চা হয়? যদি হয় তবে—

২. বনের বাঘ হরিণকে তাড়া করলে হরিণ যদি দৌড়ে পালায়, সেটা কি যৌক্তিক কাজ নয়? যদি হয়, তবে কি আমরা বলবো হরিণও দর্শন চর্চা করে?

ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: predator-victim-এর ব্যাপারগুলো বা বৃহত্তর অর্থে প্রাণীদের আচরণগুলো মূলত তাদের সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। মানুষের মধ্যে যেমন মরাল চয়েস কাজ করে, প্রাণীদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না। কথাটা দ্বিধা করে বললে এভাবে বলতে

হয়, প্রাণীদের মধ্যে মানুষের মতো intentionality নাই। তাই, তাদের কাজগুলো নৈতিক নয়, বরং জীববৃত্তিমূলক। মানুষের মধ্যে জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিকতার উচ্চতর বিষয়াবলী সমভাবে কাজ করে। অথচ, প্রাণীদের মধ্যে তাদের জীবনবৃত্তি বা সহজাত প্রবৃত্তিগুলো হচ্ছে অত্যন্ত প্রবল। যদিও তাদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা সীমিত আকারের বুদ্ধিবৃত্তি লক্ষ করা যায়।

Md. Rakibul Hasan: আপনার এ কথার সাথে আমি এখন একমত। কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা যদি দিতেন। যদিও আপনার উত্তরটি পরোক্ষভাবে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ‘হ্যাঁ’ বলে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যুক্তির ভিত্তিতে কোনো কিছু করা মানেই হলো ফিলোসফি চর্চা করা। কথাটা ঠিকই আছে। হতে পারে সে যুক্তিটা শক্তিশালী কিংবা দুর্বল, ভালো যুক্তি অথবা খারাপ যুক্তি। সাদামাটাভাবে ব্যাপারটা এরকম। যদিও ফিলোসফির কোনো বিষয়ই কনক্লুসিভ নয়।

Md. Rakibul Hasan: চূড়ান্ত যে নয়, সে-বিষয়ে আমিও একমত। তবে একটা অশিক্ষিত মানুষ যদি অযৌক্তিক কোনো একটা কাজকে যৌক্তিক মনে করে, সেটা কীভাবে ফিলোসফির চর্চা হয়, সে-বিষয়ে আমি এখনো সন্দেহান। ফিলোসফি যদি সবার যুক্তিই ধারণ করে, তবে ফিলোসফির নিজস্বতা বলে কি কিছু থাকে? ‘মতামত’ থেকে ‘ফিলোসফি’ তাহলে কোন দিক থেকে ভিন্ন?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সিদ্ধান্তের দিক থেকে ফিলোসফির কোনো নিজস্বতা নাই। বিভিন্ন ধরনের, এমনকি পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তগুলো সমভাবে ফিলোসফিক্যাল হতে পারে বা হয়। এটাই হলো ফিলোসফির সৌন্দর্য। এবং ডিসিপ্লিন হিসেবে ফিলোসফির অনন্যতা।

পদ্ধতির দিক থেকে অবশ্য ফিলোসফির নিজস্বতা আছে। সেটি হলো যুক্তি।

Md. Rakibul Hasan: তাহলে ‘দর্শন’ স্তর থেকে ‘সিদ্ধান্ত’ স্তরে পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে কী কাজ করে?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: logical analysis.

Md. Rakibul Hasan: আমি কোথাও একটা কথা শুনেছি যে সব যুক্তির একটা পাল্টা যুক্তি আছে। অর্থাৎ খারাপ একটি কাজেরও যুক্তি আছে।

আমার কথা হচ্ছে, যখন দুজন মানুষের মধ্যে কোনো একটা বিষয়ে তর্ক হয়, তারা যদি কোনো একটা বিষয়ে যুক্তির ভিত্তিতে একমত হয় এবং যে যুক্তিতে হেরে গেলো সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে সাজা ভোগ করে, এবং পরে দেখা যায় দুজনই ছিল ভুল- এমন ক্ষেত্রে যুক্তির পর্যালোচনার মাধ্যমে বিচার করাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যুক্তি লাগবে। এটার কোনো বিকল্প নাই। যুক্তি লাগবে না, সেটাও একটা যুক্তি। যুক্তি থেকে কোনো মুক্তি নাই। মানুষ যুক্তিপ্রবণ প্রাণী।

২৫ আগস্ট, ২০১৯

<https://dorshon.com/importance-of-philosophy>

ফিলোসফি কী?

[কয়েকদিন আগে অনার্স থার্ড ইয়ারে চিজমের জ্ঞানতত্ত্ব পড়াচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে এক ছাত্র বললো, ‘ফিলোসফি বলতে আসলে কী বুঝায়, এক মিনিটে তা বলেন’। তাকে আমি এই জওয়াবটা দিয়েছিলাম।]

Philosophy deals with the big questions in an argumentative way.

ফিলোসফি হচ্ছে জ্ঞানের একটি শাখা, যেটি মৌলিক প্রশ্ন বা সমস্যাগুলোকে যুক্তি দিয়ে মোকাবেলা করে। যেমন— এই যে ডাস্টারটি হাত থেকে ছেড়ে দিলাম, আর তা নিচে পড়ে গেলো। ফিজিক্সের লোকেরা বলবে, এটি নিচে পড়ার কারণ হচ্ছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি। আমরা তাদের এই কথাকে মেনে নিয়েছি।

কিন্তু মধ্যাকর্ষণ শক্তি কেন? মধ্যাকর্ষণ শক্তি না হয়ে অন্য কিছু হলো না কেন? – এই ধরনের গোড়ার প্রশ্নকে ফিজিক্স এলাউ করবে না। ফিলোসফি এগুলোকে ডিল করে। বিজ্ঞান যা বলে সেইটাকে সেইটার জায়গায় রেখে প্রদত্ত ‘উত্তরটির’ আগে কী হতে পারে, পরে কী হতে পারে সেটা নিয়ে ফিলোসফি আলোচনা করে। তাই, অন্য যে কোনো ডিসিপ্লিনের তুলনায় ফিলোসফির অ্যাপ্রোচটাই আলাদা।

সবাই বলে, দর্শন হলো জীবন ও জগতের সামগ্রিক...। ফিলোসফির এ ধরনের সংজ্ঞার সমস্যা হলো, জীবন ও জগৎ নিয়ে তো সবাই কাজ করে। লিটারেচার, হিস্ট্রি, এনথ্রোপলজি, পলিটিক্স ...। কোনটা নয়? বিজ্ঞানের বিষয়গুলোও তো জীবন ও জগতের বাইরে কোনো কিছু নয়।

কিন্তু বিগ কোয়েশেনস, ফাভামেন্টাল কোয়েশেনস— এগুলোকে সিস্টেমেটিকেলি ডিল করে ফিলোসফি।

ফিলোসফি যেসব ইস্যু নিয়ে কাজ করে সেসব ইস্যুর মৌলিকত্ব ও গভীরতার কারণে পরিসংখ্যান বা ভৌত পরীক্ষার মাধ্যমে সেগুলোকে সমাধান করা সম্ভব নয়। সেজন্য

যুক্তির হাতিয়ার বা বাহনকে ব্যবহার করতে হয়। ফিলোসফিতে এই কাজটিই করা হয়।

বিগ কোয়েশনগুলোর উত্তর পাওয়া প্রসঙ্গে স্বনামধন্য এস্ট্রোফিজিসিস্ট মিশিও কাকু বলেছেন, ‘you can wait your whole life; but you will not get an email from outside, from God or from some Supreme Being, that this is the answer to your question. You have to find out your own answer. OK?’

That’s philosophy.

২২ জানুয়ারি, ২০১৭

<https://dorshon.com/what-is-philosophy>

Problem of Defining Philosophy

Each Philosopher has given his or her own definition of philosophy. Some of them emphasized on the knowledge aspect of philosophy, some on metaphysics, some on science, some on truthness and some on language. It's like seeing an elephant by blind persons.

Actually, philosophy is not definable.

Because, the definiens of the definiendum 'philosophy' is itself dependent on philosophical assumption and interpretation. Let's consider this, 'man is a rational animal'. In this definition, 'man' is the definiendum and 'rational animal' is the definiens. Defining something is like doing a judgement on the term.

So, it's clear that we can't determine or judge the term 'philosophy' by something else. Because, it is the most fundamental and number one subject of human enterprise. Nothing is prior to philosophy, from conceptual point of view. That's why, we need to adopt philosophy to define philosophy. Using philosophy to define philosophy, creates a circularity problem; which we call begging the question fallacy.

To avoid this peculiar problem, we can go for a characteristical definition of philosophy. I have already discussed it in my earlier writings.

Anyway, around two decades earlier, I have collected the following traditional definitions of philosophy to prepare a class handout for the then fresh undergraduate students.

Epistemology biased definitions of philosophy:

1. “Philosophy is the science and criticism of Cognition” - Kant
2. “Philosophy is the science of knowledge” - Fichte

Metaphysics biased definitions of philosophy:

3. “Philosophy aims at the knowledge of the eternal, of the essential nature of the things” - Plato
4. “Philosophy is the science which investigates the nature of being as it is in itself and the attributes which belong to it in virtue of its own nature” - Aristotle
5. “Philosophy is knowledge of that which is eternal, of what God is and what flows out of this nature” - Hegel
6. “Philosophy is an attempt to know reality as against mere appearance” - Bradley
7. “Philosophy is the search for a comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of things” – weber

Science biased definitions of philosophy:

8. “Philosophy is the science of sciences” - Comte
9. “Philosophy is the sum total of all scientific knowledge” - Polson
10. “Philosophy is the unification of all knowledge obtained by the special sciences in a consistent whole” – Vount

Truth biased definition of philosophy:

11. “Philosophy is the love for 'the truth' - the complete body of knowledge that includes in it all truths - all truths organized in one great system” – Marvin

Language biased definition of philosophy:

12. “Philosophy is the logical analysis of language” – according to the logical positivists and analytic philosophers.

ফিলোসফি বলতে কী বুঝায়?

বহু বছর আগে যখন আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ভালো রেজাল্ট নিয়ে চোখ বুঁজে ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হই, তখনো ফিলোসফি নিয়ে আমার আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, বন্ধু-বান্ধব ও ঘরের লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রশ্ন ও আপত্তি ছিলো। ধারণা করছি, ফিলোসফি নিয়ে সেই আপত্তি, প্রশ্ন বা ভুল বোঝাবুঝিগুলো এখনো আছে। এরই প্রেক্ষিতে আমি আজ যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি তা হলো:

ফিলোসফি কী,

ফিলোসফির সংজ্ঞা কী হতে পারে,

ফিলোসফির মেজর এরিয়াগুলো কী কী,

ফিলোসফির প্রধান শাখাসমূহ ও

হিস্টোরি অফ ফিলোসফির ওপর কিছু ওভারঅল কথা এবং

পাশ্চাত্য দর্শন ও প্রাচ্য দর্শনের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা।

এরপর আমি ফিলোসফি পড়ার উপকারিতা নিয়ে একটুখানি বলবো।

এই সুবাদে আমরা ফিলোসফি এ পর্যন্ত মানুষকে আসলে কী দিতে পেরেছে, তা নিয়ে খানিকটা আলোচনা করবো।

সর্বশেষে, বাংলাদেশে যেভাবে ফিলোসফি পড়ানো হচ্ছে, সেটাকে উন্নততর করার জন্য আর্জেন্ট রিফর্মগুলো কী হতে পারে, তা নিয়ে কিছু কথা বলবো।

ফিলোসফি জিনিসটা আসলে কী?

এক সময় যে কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়কে ফিলোসফি গণ্য করা হতো। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি— যেসব ডিসিপ্লিনকে এখন আমরা আলাদা হিসেবে জানি,

একেবারে সবগুলো ছিলো ফিলোসফির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ফিলোসফি হচ্ছে সরকারী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো বিভাগের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ।

কী পড়ানো হয় সেখানে? ফিলোসফি জিনিসটা আসলে কী?

সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, ফিলোসফির এমন কোনো গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নাই।

তাহলে ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট আছে বা চলছে কীভাবে?

ব্যাপার হলো, আমরা যখন ফিলোসফিকে সংজ্ঞায়িত করতে যাবো, তখন আমাদের বিবেচনা করতে হবে, যে বিষয়ের সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে এবং যা দিয়ে সংজ্ঞাটা দেয়া হচ্ছে, এই দুইটা আলাদা কিন্তু সমার্থক হতে হবে। তো, যে বিষয়টি দিয়ে আমি ফিলোসফির সংজ্ঞা দেবো, ফিলোসফি নিজেই ওই বিষয়ের সাথে এনগেইজ হয়ে পড়বে। ডেফিনিয়েন্স হিসেবে ওই বিষয়টা কী, কেন, সেটার ভিতরে কী আছে, সেটি কোথেকে এসেছে, সেটার ভ্যালিডিটি কী, এসব নিয়ে ফিলোসফি এনগেইজ হয়ে পড়বে।

এই দৃষ্টিতে দেখলে বুঝবেন, ফিলোসফিকে প্রচলিত পদ্ধতিতে ডিফাইন করার ক্ষেত্রে আমরা এক ধরনের চক্রক দোষ বা সার্কুলারিটি প্রবলেমের সম্মুখীন হই। একে এক ধরনের গোলক ধাঁধা বা প্যারাডক্সও বলা যেতে পারে। সে জন্য ফিলোসফির সবচেয়ে প্র্যাক্টিক্যাল যে সংজ্ঞাটি আমি ঠিক করেছি সেটি আপনারা শুনলে হাসবেন। সেটা হচ্ছে, philosophy is what the philosophers do, when they do philosophy. আগেই বলেছি, সংজ্ঞা দেয়ার নিয়মানুসারে এটি একেবারেই বাজে।

এই গোলমালে পরিস্থিতি হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে ফিলোসফিকে সংজ্ঞায়ন করার পরিবর্তে ফিলোসফিকে চিনতে পারার জন্য আমরা এর কিছু অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যকে আইডেন্টিফাই করতে পারি।

১. বিগ ইস্যু:

ফিলোসফির প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, ফিলোসফি বিগ, বেসিক এন্ড ফান্ডামেন্টাল ইস্যু ও প্রবলেমেগুলোকে নিয়ে এনগেইজ হয়। কোনো কিছু কীভাবে করা যায়, কীভাবে হয়েছে— এসব ফিলোসফির আলোচনার বিষয় নয়। Philosophy deals with the 'what' question in 'why' format.

২. ফ্রি ডিসকাশন:

ফিলোসফির দ্বিতীয় অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো, ফিলোসফির মধ্যে কোনো অন্ধবিশ্বাস বা ডগমা থাকতে পারবে না, পূর্বনির্ধারিত কোনো বাউন্ডারি থাকতে পারবে না,

কোনো ধরনের বিচারবিশুদ্ধ বাধ্যবাধকতা থাকতে পারবে না। ফিনেস বা ওপেননেস থাকতে হবে পূর্ণমাত্রায়। ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশনে যে কারো যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকার থাকতে হবে। এমনকি যদি সে প্রশ্ন ভুলও হয়। প্রশ্নকর্তা কর্তৃক ক্যাটাগরি মিসটেক করে ভুল প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে, কেন প্রশ্নটি ভুল। But you must entertain the question first.

৩. আর্গুমেন্ট:

তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি কোনো আলোচনাকে ফিলোসফির মানে উন্নীত করে সেটি হচ্ছে যুক্তি বা আর্গুমেন্টের ব্যবহার। Whatever you say, you must show your own argument. সো, ফিলোসফি হচ্ছে কোনো মৌলিক বিষয়ে মুক্ত ও যৌক্তিক আলোচনা। আর্গুমেন্টেটিভ অ্যানালাইসিস ছাড়া ফিলোসফি হয় না।

ফিলোসফি এজ আ সেকেন্ড-অর্ডার সাবজেক্ট

ফিলোসফি কোনো ট্র্যাডিশনাল সাবজেক্ট বা ডিসিপ্লিন নয়। এটি অলওয়েজ আ সেকেন্ড-অর্ডার সাবজেক্ট।

অ্যাকচুয়েলি, অন্যান্য সাবজেক্টগুলোর সাথে আমরা যদি এইভাবে এনগেইজ হই, উপরে আমি যেভাবে বললাম, অর্থাৎ একটা সাবজেক্টের আলোচনা যেখান থেকে শুরু হয়, তার আগের বিষয়গুলো কী হতে পারে, বা যেখানে সেটি শেষ হয়, এর পরে আমরা এটা নিয়ে কী করতে পারি, এর পরে কী কীভাবে হতে পারে, এমন হলে কেমন হবে, অমন হলে কেমন হবে— ওই সাবজেক্ট সম্পর্কে এ ধরনের ‘অতিরিক্ত’ বিষয়াদি নিয়ে যদি আমরা এনগেইজ হই, ওপেন ডিসকাশন করি, এবং আমরা যা কিছু করছি বা বলছি, সেটার পক্ষে যদি কোনো না কোনো কারণ বা যুক্তি তুলে ধরি, তাহলে সেটি ওই সাবজেক্টের ফিলোসফি হয়ে উঠবে। In that sense, philosophy is always philosophy of something.

দর্শন, জীবন ও জগৎ

ফিলোসফির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সাধারণত বলা হয়, ‘দর্শন হলো জীবন ও জগতের ...।’ এগুলো খুবই মিসলিডিং এন্ড ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেফিনেশন। কারণ, প্রত্যেক জ্ঞানকাণ্ডই নিজের মতো করে জীবন ও জগৎ নিয়ে কাজ করে। তাই, জীবন ও জগৎ মানেই ফিলোসফি, এটা ফিলোসফি সম্পর্কে গণহারে ফিলোসফি পড়তে আসা আমজনতার একটা পপুলার মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। বরং, ফিলোসফির আছে সুনির্দিষ্ট বা ডিসটিঙ্কটিভ মেথড। সেটি বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে

ধারণা নির্মাণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এনগেইজ হলেই কেবল কোনো আলোচনা ফিলোসফি হয়ে উঠে।

দর্শনের মূল অংশ ও শাখাসমূহ:

ফিলোসফির মূল জায়গা অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স। মেটাফিজিক্সে বাস্তবতা (reality) অথবা সত্তা (being) নিয়ে আলোচনা করা হয়। মেটাফিজিক্সের মধ্যে দুইটা ভাগ আছে। একটা ভাগ হচ্ছে তত্ত্ববিদ্যা বা অন্টোলজি, যেটাতে বস্তু ও বাস্তবতার স্বরূপ আলোচনা করা হয়। আরেকটা ভাগ হচ্ছে বিশ্বতত্ত্ব বা কসমোলজি, যেখানে জগৎ উৎপত্তির কারণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। অন্টোলজি এবং কসমোলজি, এই দুইটা নিয়ে হচ্ছে মেটাফিজিক্স।

মুদ্রার অপর পিঠের মতো ফিলোসফির গুরুত্বপূর্ণ বা কোর অংশ হলো এপিসটিমোলজি বা জ্ঞানতত্ত্ব। যেখানে জ্ঞানের উৎপত্তি ও জ্ঞানের যাচাই নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এরপর ফিলোসফির যে কোর অংশটা আছে, সেটাকে আমরা একসাথে বলতে পারি মূল্যবিদ্যা (axiology)। মূল্যবিদ্যার তিনটা শাখা আছে। একটা হলো যুক্তিবিদ্যা বা লজিক, আরেকটা হলো নীতিবিদ্যা বা এথিক্স, আরেকটা হলো সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব (aesthetics)। লজিক বা যুক্তিবিদ্যায় চিন্তার শুদ্ধ নিয়ম, বৈধ যুক্তি বনাম অবৈধ যুক্তি, সবল যুক্তি বনাম দুর্বল যুক্তি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এক সময় লজিক ছিলো অবরোহী যুক্তিবিদ্যা (ডিডাক্টিভ লজিক) এবং আরোহী যুক্তিবিদ্যায় (ইনডাক্টিভ লজিক) সীমাবদ্ধ। অ্যারিস্টটলিয়ান লজিক হিসেবে যেটাকে আমরা জানি। বর্তমানে লজিকের আরো অনেক অনেক শাখা-প্রশাখা বের হয়েছে। conductive-এর পাশাপাশি abductive reasoning, inference to the best explanation যার মূল কথা। আছে informal logic এবং mathematical logic। এভাবে লজিকের নতুন অনেক শাখা বের হয়েছে।

মাঝখানে একটা কথা বলে নিই। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিক শাখার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে ফিলোসফির অপরাপর সবকিছুকে বাদ দিয়ে কেন যেন শুধু লজিকের কোর্স দেয়া হয়। এ থেকে অনেকেই ভুল করে মনে করে, দর্শন মানে যুক্তিবিদ্যা। কিন্তু না, দর্শন মানে যুক্তিবিদ্যা নয়। Logic is a tool that is used for philosophical discussion. আমাদের ডিপার্টমেন্টে এ রকম কোর্স আছে যার শিরোনাম হলো ‘ফিলোসফিক্যাল লজিক’ বা ‘ফিলোসফি অব লজিক’। এ ধরনের কোর্স-টাইটেল থেকেই আমরা বুঝতে পারি, logic itself is not philosophy, though it is the way of doing philosophy.

লজিক হচ্ছে মূল্যবিদ্যার এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারপর আছে এথিক্স। এথিক্স মানে যা কিছু হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। would অথবা should যখন আমরা ব্যবহার করবো, কোনো নরম্যাটিভ অ্যাসপেক্ট যখন ইনভলভ হবে, তখন সেটা হবে এথিক্স। নীতিবিদ্যার তিনটা ভাগ: (ক) আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা (normative ethics), যেখানে নৈতিকতার সাধারণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। (খ) পরানীতিবিদ্যা (meta-ethics), যেখানে নৈতিক পদসমূহকে (terms) বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন, ভালো বলতে আমরা কী বুঝি, ভালো'র স্বরূপ কী ইত্যাদি। (গ) প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা, যেখানে নৈতিক মতবাদসমূহের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়।

এরপরের বিষয়টি হচ্ছে সৌন্দর্যতত্ত্ব বা aesthetics। Sense of beauty, what makes something beautiful, what is beauty itself – এগুলো হচ্ছে নন্দনতত্ত্ব বা এসথেটিক্সের বিষয়।

এবার ফিলোসফির শাখাসমূহের কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন: philosophy of economics, philosophy of physics, philosophy of politics, or political philosophy, philosophy of society, or social philosophy। এভাবে philosophy of ... দিয়ে ফিলোসফির বহু ব্রাঞ্চ হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, মানুষ যত সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করে তত সাবজেক্টেরই দর্শন শাখা হতে পারে।

প্রাচ্য দর্শন

আমরা ফিলোসফির যে সমস্ত কারিকুলাম এবং সিলেবাসগুলো মেনটেইন করি, সেখানকার তৃতীয় অংশটি হচ্ছে ইস্টার্ন ফিলোসফি। উপরে যা বললাম, তা মূলত পাশ্চাত্য ধারার দর্শন। এর পাশাপাশি প্রাচ্য দর্শন বা ইস্টার্ন ফিলোসফির মেজর ট্রেন্ড হচ্ছে দুটি: মুসলিম ফিলোসফি এবং ইন্ডিয়ান ফিলোসফি। একইসাথে বাংলাদেশের মানুষ হওয়ার কারণে ‘বাংলাদেশ ফিলোসফি’ নামের একটি কোর্স আমরা পড়িয়ে থাকি। এগুলোর সাথে দূর প্রাচ্যের দর্শন বা ফার ইস্টার্ন ফিলোসফি নামে একটি কোর্স আমরা চালু করেছি, যেখানে চাইনিজ এবং জাপানিজ ফিলোসফিগুলো পড়ানো হয়।

দর্শনের ইতিহাস

ফিলোসফির ইতিহাসকে জানার চেষ্টা করলে আমরা দেখবো, বর্তমানে যে ফিলোসফি আমরা পাই, সেটার উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীন গ্রিসে। সেখানে ‘জগতের আদি উপাদান কী?’ – এই প্রশ্নটা ছিলো মূল প্রশ্ন। তখন কেউ বলেছে পানি; কেউ বলেছে আকাশ; কেউ বলেছে বাতাস; কেউ বলেছে আগুন ইত্যাদি। এই প্রশ্নটিকে ফিলোসফির

সূচনাবিন্দু হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও এর আগে এই প্রশ্ন মানুষ করে নাই, এমন নয়। এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পায় নাই, এমনও নয়। ব্যাপার হলো, স্বীয় বিবেক-বুদ্ধির ওপর ভরসা না করে এর আগে মানুষ এই প্রশ্নের বা এই ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতো মিথোলজি বা ধর্ম থেকে। তেমন যোগ্য কেউ একজন আমাদের বলে দেবে, মানুষ এই অপেক্ষায় থাকতো। পরবর্তীতে মানুষ যখন নিজেই যুক্তির সাহায্যে নিজের মনে জাগ্রত হওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার চেষ্টা করেছে, তখন থেকেই ফিলোসফি শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়।

গ্রীক ফিলোসফিতে আমরা প্রধান যে ক্যারেক্টরগুলো পাই: সক্রটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল- এরা তিনজনই কিন্তু তাদের মতো করে আন্তিক ছিলেন। গ্রীক ফিলোসফিতে আন্তিকতা ও নাস্তিকতার উভয় ধারাই পাশাপাশি ছিলো। অপ্রিয় সত্য হলো, গ্রীক ফিলোসফি বলতে আমরা যা পাই, এর শুরু হয়েছে নাস্তিকতা দিয়ে। যদিও, একটু আগেই বলেছি, তাদের প্রমিনিয়ান্ট ফিলোসফারগণ ছিলেন আন্তিক ধারার।

গ্রীক ফিলোসফির পর উল্লেখযোগ্য হলো মধ্যযুগীয় দর্শন। মধ্যযুগে মুসলিম ফিলোসফি ছিলো প্রমিনিয়ান্ট। ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি গ্রীক থেকে বর্তমান ওয়েস্টে এসেছে মুসলিম ট্র্যাডিশনের মাধ্যমে। মুসলমানরা যখন গ্রীক বইগুলো অনুবাদ করা শুরু করেছে, তখন তাদের মধ্যে দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে, এমন কথা আমাদের বই-পুস্তকে লেখা হয়।

আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ড. বদিউর রহমান হাসান আল বসরী একটি রিসালাহ অনুবাদ ও ইন্টারপ্রিট করে পিএইচডি করেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, যখন উমাইয়া শাসকরা যুলুম-নির্যাতন শুরু করলো এবং সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত বা তাকদীরের লিখন বলে যখন তারা ইন্টেলেকচুয়াল লেজিটেমিসি পাওয়ার চেষ্টা করলো, তখন সেখানকার জ্ঞানী, গুণী, ফকীহ এবং চিন্তাবিদগণ সেটার প্রতিবাদ করেছিলেন। তারমধ্যে ইমাম হাসান আল বসরী ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন তাবয়ী। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকা না থাকা নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি একটি রিসালাহ (পুস্তিকা) লেখেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, অভ্যন্তরীণ সংকটজাত নানা প্রয়োজনে মুসলমানদের ভেতরেই যে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা শুরু হয়েছিল, সেটাই মুসলিম ফিলোসফি বলতে এখন আমরা যা পাই তার উৎপত্তিগত কারণ। আমরা বড়জোর এ কথা বলতে পারি, মুসলিম ফিলোসফির বিকাশে গ্রীক সোর্সগুলো পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মেডিয়েভাল ফিলোসফির পর হচ্ছে মডার্ন ফিলোসফি। মডার্ন ফিলোসফির শুরু আমরা ধরি বেকন এবং ডেকার্ট থেকে। যারা অবজার্ভেশন এবং সায়েন্সকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সবকিছুকে সিস্টেমেটিক্যালি অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা

করেছেন। এরপর সেটা কান্ট হয়ে হেগেল পর্যন্ত এসেছে। হেগেলকে আমরা ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ধরি। হেগেলের পরবর্তী দর্শনকে বলা হয় পোস্ট-হেগেলিয়ান বা কনটেম্পোরারি ফিলোসফি।

হেগেলের পর, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশনগুলো অ্যানালাইটিক ট্রেন্ড এবং কন্টিনেন্টাল ট্রেন্ডের মধ্যে ভাগ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান, জার্মান তথা যারা ইংরেজি ভাষাভাষী নয়, তাদের ফিলোসফির মধ্যে জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখার একটা ডমিনেন্ট ট্রেন্ড লক্ষ করা যায়। তারা ব্যক্তিমানুষ ও মানবিক আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি নিয়ে অনেক বেশি কনসার্ন ফিল করেছে। ফিলোসফির এই ধারাকে আমরা বলি কন্টিনেন্টাল ফিলোসফি। যেখানে আছে অস্তিত্ববাদ, ডিকসট্রাকশন, স্ট্রাকচারালিজম, হারমেনেউটিক্স ইত্যাদি। মোটাদাগে এগুলো উত্তর-আধুনিকতাবাদী ধারা।

অন্যদিকে ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা তথা যারা মূলত ইংরেজিতে কথা বলে, তাদেরকে নিয়ে বিশ্লেষণী ধারা বা অ্যানালাইটিক ট্রেন্ড। তবে স্মরণে রাখতে হবে, যারা ইংরেজিতে কথা বলে তারা অ্যানালাইটিক, আর যারা ইংরেজিতে কথা বলে না তারা কন্টিনেন্টাল, ব্যাপারটা এমন সাদামাটা ভাগাভাগির ব্যাপার নয়। এটা একটা গ্রস ভিভিশন। অর্থাৎ এই ভাগাভাগিটা খুব একটা প্রিসাইস ও ক্লিয়ার নয়।

তদুপরি, মহাদেশীয় ধারা এবং বিশ্লেষণী ধারার এই বিভাজনটা তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সময়ের। যেমন, আমরা যদি ইমানুয়েল কান্টের কথা বলি, তিনি ছিলেন জার্মান ফিলোসফার। কিন্তু তিনি কি কন্টিনেন্টাল ট্রেন্ডের? তা তো নয়। আসলে কন্টিনেন্টাল এবং অ্যানালাইটিক— এই ভাগাভাগিটাই হয়েছে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী থেকে। যারা অ্যানালাইটিক ট্রেন্ডের ফিলোসফার অর্থাৎ যারা অ্যাংলো-আমেরিকান, তারা ফিলোসফি নিয়ে অ্যানালাইসিস, বিশেষত ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যানালাইসিস এবং সিস্টেমেটিক স্টাডির উপর অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করে। ফিলোসফিক্যাল প্রবলেমগুলোকে তারা যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখার চেষ্টা করেছে।

আমাদের এখানকার ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টগুলো মূলত অ্যানালাইটিক ট্রেন্ডের। আমি নিজেও মনে করি, analytic trend is more philosophical। যাহোক, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনের মেরিট-ডিমেরিট

এখন আমরা সংক্ষেপে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফির সাথে ইস্টার্ন ফিলোসফির তুলনামূলক আলোচনা করবো। ওয়েস্টার্ন ফিলোসফির সুবিধা হচ্ছে, ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিতে freeness, argument basis discussion এবং in-depth analysis—এর মতো

ফিলোসফির এই মূল বিষয়গুলোকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর দেখা যায়। ফিলোসফির সব এরিয়াতেই ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি কাজ করে।

ওয়েস্টার্ন ফিলোসফির প্রবলেম হচ্ছে, এটি দ্বন্দ্বিক বা ডায়কোটিক। তারা প্রশ্ন করে—জ্ঞানের উৎস হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদ সঠিক নাকি বুদ্ধিবাদ সঠিক? কান্টের মতো কেউ কেউ সমন্বয় করার চেষ্টা করলেও তাদের মূল ট্রেন্ড হচ্ছে বাইনারি। বাস্তববাদকে আমরা সঠিক মনে করবো, নাকি ভাববাদকে সঠিক মনে করবো? – এ ধরনের একটা কাল্পনিক দ্বন্দ্ব নিয়ে তারা পেরেশান। চিন্তার এই দ্বন্দ্বিক বিভ্রান্তি হতে প্রাচ্য দর্শনকে আমরা মুক্ত দেখতে পাই।

ইস্টার্ন ফিলোসফির আলোচনা হচ্ছে অনেক বেশি ক্রমসোপানমূলক বা হায়ারার্কিকাল এবং সমন্বয়ধর্মী বা ইন্টিগ্রেশন ওরিয়েন্টেড। এখানে জ্ঞানের উৎস প্রাথমিকভাবে অভিজ্ঞতা। যেহেতু অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা সবকিছু পাই না, সেজন্য বুদ্ধি হচ্ছে অভিজ্ঞতার উপরিস্থিত বিষয় বা হায়ার অথরিটি। কিন্তু বুদ্ধি আমাদেরকে সব জ্ঞান দিতে পারে না, সেজন্য আমরা স্বজ্ঞার দ্বারস্থ হই। রেভিলেশন বা ওহী হলো ইলহাম বা স্বজ্ঞার পরিশীলিত বা চূড়ান্ত রূপ।

সমন্বয়ধর্মী দার্শনিক চিন্তাধারার উদাহরণ হিসেবে উপরে আমরা জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত মতবাদগুলোর স্ট্রাকচার সম্পর্কে বললাম। প্রাচ্য দর্শনের সবগুলো ধারায় এক ধরনের ইন্টিগ্রেটিভ হায়ারার্কির কথা বলা হয়। বিশেষ করে মুসলিম ফিলোসফি এবং ইন্ডিয়ান ফিলোসফির এটি কমন বৈশিষ্ট্য।

মুসলিম ফিলোসফি বা ইন্ডিয়ান ফিলোসফির প্রবলেম হচ্ছে, ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশনের জন্য যে ফ্রিনেস থাকা দরকার, এগুলোতে সেটা ততটা নাই। এগুলো বরং অনেক বেশি অথরিটিটিভ ও ডগম্যাটিক। স্ক্রিপ্টচ্যুয়াল রেফারেন্সের বার্ডেন এখানকার ফিলোসফি চর্চার মধ্যে অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। অথচ আমরা জানি, যত বেশি রেফারেন্সের বার্ডেন থাকবে, ফিলোসফিক্যাল এনালাইসিস হবে তত দুর্বল। এ জন্যই দেখা যায়, ইস্টার্ন ট্রেন্ডের ফিলোসফিগুলো অধিকতর মাত্রায় বর্ণনামূলক ও সাজেস্টিভ। স্বাধীন বিশ্লেষণ সেখানে থাকে কম।

হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং ইন্টারেস্টের যতগুলো এরিয়া আছে বা হতে পারে তার অনেকগুলো ইস্যু বা এরিয়াকে আমরা ইস্টার্ন ফিলোসফিগুলোতে তেমন একটা দেখতে পাই না। আজকে থেকে কয়েক শতাব্দী আগে যেই আলোচনাগুলো হয়েছে, সেগুলোর ধারাবাহিকতাই এখনো সেখানে মেইন ট্রেন্ড বা বেসিক কন্টেন্ট। নতুন করে সেখানে তেমন কোনো কন্টেন্ট যুক্ত হচ্ছে না। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তি কিছু বিষয়ে হয়তো আলোচনা করেছে। তারাও মূলত নানাভাবে

ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি দ্বারা প্রভাবিত। সেগুলো কতটা মৌলিক, ভাবাবেগমুক্ত হয়ে বিবেচনা করলে তা প্রশংসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা দেখতে পাই, নানা ধরনের পলিটিক্যাল আসপেক্ট বর্তমান মুসলিম ইন্টেলেক্টকে প্রভাবিত করে আছে। এটাকে আমরা বড়জোর ইসলামিক পলিটিক্যাল ফিলোসফি হিসেবে বলতে পারি। কিন্তু ফিলোসফির মেইনস্ট্রিম তথা মেটাফিজিক্স, এপিসটিমোলজি, লজিক, এথিক্স ও এসথেটিক্স নিয়ে ইস্টার্ন ফিলোসফিতে হালনাগাদের তেমন কোনো কাজকর্ম আমার চোখে পড়েনি। প্রমোশন নেয়ার জন্য ফিলোসফির শিক্ষকগণ যেসব রুটিন রিসার্চ করেন সেগুলো বেসিক রিসার্চ হিসেবে কতটুকু ধর্তব্য, তা বিবেচনা সাপেক্ষ। সংগত কারণে এ ধরনের 'স্পর্শকাতর' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ এখানে অন্তত নাই। মোটকথা হলো, আসলে মুক্তজ্ঞান আলোচনা হিসেবে ফিলোসফি ডিসিপ্লিনটার মূলধারা হচ্ছে পাশ্চাত্য দর্শন, এটি অনস্বীকার্য।

ফিলোসফি পড়ে আমরা কী পেতে পারি? ফিলোসফি আমরা কেন পড়বো?

ফিলোসফি পড়লে আমরা অ্যানালাইটিক পাওয়ার অর্জন করতে পারি। আমাদের মধ্যে ত্রিটিকাল থিংকিং ডেভেলপ করবে। ফিলোসফি আপনাকে একটা এথিক্যাল লাইফ দেবে। অথবা, আপনি যখনই একটা এথিক্যাল লাইফ মেনটেইন করতে যাবেন, আপনার আদর্শ যা-ই হোক না কেন তা শেষ পর্যন্ত দর্শন হয়ে উঠতে বাধ্য। আমরা যদি একটা নলেজ বেইজড সোসাইটি করতে চাই, আমরা যদি একটা প্লুরালিস্টিক সোসাইটি করতে চাই, তাহলে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার হলো ফিলোসফি চর্চা করা। এবং ফিলোসফির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেয়া। এর কারণ হলো, জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে একমাত্র ফিলোসফিই হলো সত্যিকার অর্থে ইনক্লুসিভ। ফিলোসফিতে কোনো কনট্রিক্ট কথাবার্তা নাই। সব ফিলোসফাররা মিলে একটা কথা বলেছে বা বলবে, এমনটা হওয়ার নয়। যুক্তি এখানকার মূল শক্তি। বৈচিত্র্য এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানবিকতা এর মূল ভিত্তি।

অনেকে বলতে চান, ফিলোসফি আমাদেরকে সর্বসম্মতভাবে কনট্রিক্ট কিছু দেয় না, এটি ফিলোসফির ডিমেরিট। অ্যাকচুয়েলি, ফিলোসফি মানুষকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করে এবং মানুষের কগনিটিভ ক্যাপাসিটিকে উপযুক্ত বলে মনে করে। ফিলোসফি মনে করে, আমরা মানুষেরা কোনো বিষয়ের ভালোমন্দ বুঝার পরে আমাদের স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে কোনো একটা পক্ষকে বেছে নেবো।

ফিলোসফির এই ফ্রিনেস এক ধরনের প্যারাডক্স তৈরি করে। Philosophy is open, but as a person, when I take a philosophical position, I prefer something than the others, actually I cancel all other positions. It

is in a sense, kind of dogmatism. তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাদবাকি মতামতগুলোকে কার্যত বাদ দিলেও আমি জানি, যেগুলোকে বাদ দিচ্ছি, সেগুলোর পেছনেও কিন্তু কিছু না কিছু যুক্তি আছে। যদিও সেই যুক্তিটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। উল্লেখ্য, কোনো বিষয়ে যেই ধারার যুক্তিকে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, সেটাকেই আমি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করি অথবা দাবি করি।

বিবদমান সত্যদাবিগুলোর সবগুলোকে আমরা একইসাথে সঠিক হিসেবে নিতে পারি না। মর্মান্তিক বিষয় হচ্ছে, যারা বলে বুদ্ধি হচ্ছে জ্ঞানের অধিকতর গ্রহণযোগ্য উৎস, তাদের পজিশনও কিন্তু এক ধরনের ডগম্যাটিক পজিশন। কারণ, সব জ্ঞান অর্জন করার আগেই তথা কিছু জ্ঞান অর্জন না করেই একজন বুদ্ধিবাদী ধরে নেয় বা বিশ্বাস করে বসে, বুদ্ধির সোর্স থেকে যে জ্ঞান আমি পাবো, সেটিই একমাত্র সঠিক। একজন বুদ্ধিবাদীর এই ধরনের বিশ্বাস বা ধারণা তার বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যায়। বুদ্ধিবাদের কথাটা উদাহরণ হিসেবে বলা হলেও সব ‘বাদ’-এর জন্যই এটি প্রযোজ্য। বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদসহ সব ‘বাদ’-এর গোড়াতে আছে বিশ্বাস। অবশ্য, জ্ঞান মাত্রই বিশ্বাস। যদিও সব বিশ্বাস জ্ঞান নয়। জ্ঞান হলো যাচাইকৃত সত্য বিশ্বাস।

ফিলোসফির কন্ট্রিবিউশন

ফিলোসফি এ পর্যন্ত আমাদেরকে কী দিয়েছে? উৎপাদন ব্যবস্থার দিক থেকে ফিলোসফির তেমন কোনো কন্ট্রিবিউশন আমরা দেখতে পাই না। তবে ফিলোসফি মানুষকে মানুষ বানিয়েছে। ফিলোসফি মানুষকে সভ্য করেছে। আমরা বলতে পারি, human civilization is a contribution of philosophy. It is philosophical urged that has engaged us in scientific query, investigation and research. কীভাবে একজন সায়েন্টিস্ট রিসার্চ করে সেটা সায়েন্সের বিষয়। কিন্তু কেন সে এই কাজটি করে, তা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখবো, তার ভেতরে একটা অন্তর্গত তাড়না বা দুর্নিবার প্রেরণা কাজ করে। এই তাড়নাটি হলো ফিলোসফিক্যাল ইনকুইজিটিভনেস।

আমরা জানি, ফিলোসফি কথাটা এসেছে দুটো গ্রীক ওয়ার্ড থেকে: philos এবং sofia, যার অর্থ ইংরেজিতে বলা হয়, love of wisdom। জ্ঞানের প্রতি এ ধরনের ভালোবাসা, যেটাকে মানুষ কোনোভাবেই দমিয়ে রাখতে পারে না, সেটা তাকে সায়েন্সে এনগেইজ করেছে। সায়েন্সের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি এক ট্রিমেন্ডাস কন্ট্রিবিউশন- টেকনোলজি।

ফিলোসফি হচ্ছে যে কোনো সিরিয়াস আলোচনার লাইফ-লাইন বা ফাউন্ডেশন। কোনো একটা স্কলারলি ডিসকাশন, স্টাডি, রিসার্চ, যাই হোক না কেন, there has to have a philosophical foundation and basis.

ফিলোসফির আরেকটা কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে, যেখানে আমাদের চিন্তা আটকে যায়, আমরা কোনো পথ বের করতে পারি না, সেখানে ফিলোসফি আমাদেরকে সম্ভাব্য অন্টারনেটিভগুলোকে দেখিয়ে দেয়। আন্ডারলায়িং রিয়েলিটিকে এক্সপোজ করে। আপনি যে কোনো দিকে যেতে পারেন, যে কোনোটাকে পছন্দ করতে পারেন। Yet, whatever you think right and better for you, you must find it on some truth basis, and you must let others to know your argument for your thoughts and position.

সর্বশেষ আমি বলবো, ফিলোসফিক্যাল প্রসেস হচ্ছে একটা ইউনিক প্রসেস। ফিলোসফিক্যাল জ্ঞান আমাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়। অন্য কোনো বিষয় আমাদেরকে কোনো নিশ্চয়তা দেয় না। আমি একটা বিষয় আজকে দেখেছি, কালকে দেখেছি, বিগত অনেক বছর থেকে দেখেছি— এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা ইনডাস্ট্রি প্রসেসে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি— হ্যাঁ, এটা হবে।

কিন্তু ফিলোসফিতে যে a priori truth, অ্যানালাইটিক স্টেইটম্যান্ট ও লজিক তথা চিন্তার নিয়মগুলো আছে, সেগুলো দিয়ে আমরা সুনিশ্চিত জ্ঞান পেতে পারি। এমন কোনো একটা সার্কেল পাওয়া যাবে কিনা, যেটা একইসাথে স্কয়ারও বটে— এই প্রশ্নের উত্তরে ফিলোসফি বলবে— না, এটি অসম্ভব। কোনো একটা আমের মধ্যে খেজুরের আঁটি পাওয়া যাবে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে আমরা তত্ত্ববিদ্যার দৃষ্টিকোণ হতে বলতে পারি— না, কখনো সেটা পাওয়া যাবে না। কারণ, আম কথাটার মধ্যেই খেজুর কথাটা এক্সক্লুড হয়ে যায়। এর জন্য কোনো প্রকার ডাটা এনালাইসিস বা সায়েন্টিফিক রিসার্চের দরকার পড়ে না।

টাইম ট্রাভেল নিয়ে অনেক ফ্যান্টাসি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু অস্টোলজি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, অতীতকে পরিবর্তন করলে তা আর অতীত থাকে না। বরং তা এক ধরনের অতীত-নির্ভর বর্তমান হয়ে দাঁড়ায়। এই দৃষ্টিতে ফিলোসফিক্যালি আমরা বুঝতে পারি, সময়ের অতীতমুখী যাত্রা অসম্ভব। টাইম ট্রাভেল বলতে যদি বুঝানো হয়, আমরা অতীতে গিয়ে দেখবো কীভাবে ঘটনাগুলো ঘটেছে, যেভাবে আমরা টেপ রেকর্ডারে রোল-ব্যাক করি, অথবা আমাদের মেমরিকে যেভাবে রোল-ব্যাক করি, সেভাবে যদি টাইম ট্রাভেলকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে টাইম ট্রাভেল হতে পারে। কিন্তু কোনো একটা ঘটনা, যেটা ঘটে গেছে, সেটাকেই অতীতে গিয়ে আবার নতুন করে ঘটানো অসম্ভব।

এভাবে ফিলোসফি আমাদেরকে সুনিশ্চিত জ্ঞান দেয়, যেটা আমরা অন্য সাবজেক্ট থেকে পাই না। তবে এই সুনিশ্চিত জ্ঞানটা আমাদের মতো করে আমাদেরকে অর্জন করে নিতে হয়। ফিলোসফি বলে, কেউ তোমাকে কিছু চাপিয়ে দেবে, সেটা তোমার জন্য সঠিক নয়। বরং তুমি তোমার সাধ্য মোতাবেক যাচাই করে সত্যকে গ্রহণ

করো। আবার, আমি আমার মতো করে একটা কিছু করে নিলেই সেটা সত্য হয়ে যায়, এটিও সঠিক নয়। আমি আসলে সেটাই খুঁজে পাই, যেটা আগে থেকেই ফিজিক্যালি বা পটেনশিয়ালি বিদ্যমান ছিলো।

যেভাবে ফিলোসফি পড়ানো হচ্ছে

বাংলাদেশে যেভাবে ফিলোসফি পড়ানো হচ্ছে তাতে করে বছরে এক থেকে দেড় হাজার ফিলোসফির গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে। তারা সবাই ফিলোসফিতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনও করছে। ফিলোসফির এত এত এক্সপার্টের কী দরকার? সেজন্য উচ্চশিক্ষায় ফিলোসফি পড়তে আসা স্টুডেন্টদের সংখ্যা কমানো উচিত। একটা ক্লাসে কোনোক্রমেই ৩০/৪০ বা ৫০ জনের বেশি স্টুডেন্ট হওয়া উচিত নয়। মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য ক্লাসরুমের মধ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদি থাকা জরুরি। ফিলোসফির জন্য এটি অনেক বেশি দরকার। কারণ, ফিলোসফি চর্চার জন্য কোনো ধরনের যন্ত্রপাতি ও ভৌত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার না পড়লেও ফিলোসফির জন্য অনেক বেশি দরকার পড়ে চিন্তা করার মতো পরিবেশের।

সেই জন্য আমাদের প্রকৃতি বা আল্লাহ প্রদত্ত যে থিংকিং মেশিন, সেটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য ক্লাসরুম ফ্যাসিলিটিজ তেমন হওয়া উচিত। শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েশন এবং ডিগ্রি লাভের জন্য ফিলোসফি পড়া বন্ধ হওয়া উচিত। এরই সাথে আমাদের যে বৎসরান্তে অনুষ্ঠেয় sitting exam system, এটা অবিলম্বে বন্ধ করে সারা বছর জুড়ে স্টুডেন্টদেরকে নানাভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। এভাবেই সম্ভব প্রকৃত মেধাবী স্টুডেন্টদেরকে তাদের প্রাপ্য গ্রেড দেওয়া। সর্বোপরি, এটি নিশ্চিত করতে হবে, ফিলোসফি তারাই পড়বে যাদের জানার আগ্রহ আছে।

ফিলোসফি ফর অল

আমাদের জাতীয় জীবনের বিদ্যমান সংকট, আইডেন্টিটি ক্রাইসিস ইত্যাদি সমাধান করার জন্য আমাদের উচিত প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি লেভেলে ফিলোসফির কিছু বেসিক কোর্স চালু করা। ছোটদেরকে তাদের মতো করে সহজ করে চিন্তার নিয়মগুলো সম্পর্কে বলা। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে যদি আমরা স্কুলের ছাত্রদেরকে বুঝাতে পারি, তাদের মতো করে সহজ করে; তাহলে কেন নয় ফিলোসফি? এবং ফিলোসফিকে যদি আমরা প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি লেভেলে ইনট্রুডিউস করি, তাহলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের যে মূল লক্ষ্য, সৃজনশীলতা, সেটা গড়ে উঠবে।

আমার মতে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার সিস্টেম এমন হওয়া উচিত, যে কোনো সাবজেক্টে কোনো স্টুডেন্ট পড়াশোনা করবে, সে ফিলোসফির কোনো না কোনো কোর্স নন-মেজর হিসেবে নিতে পারবে। এবং সেখান থেকে সে কিছু ক্রেডিট অর্জন

করবে। তাহলে ফিলোসফি সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে ভীতি অথবা ভুল ধারণা তা অনেকাংশে দূরীভূত হবে।

আর্টিকেলটি নিম্নোক্ত ভিডিও আলোচনার আলোকে তৈরি করা হয়েছে:

<https://www.youtube.com/watch?v=gqyDlHlom1U>

[স্মার্টফোনে ভিডিওটি দেখতে পাশের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন]



১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

Philosophy is not meant to give any specific answer.
Yet whatever answer you prefer, that one is
necessarily philosophical.

যুক্তি ও আবেগের সম্মিলন

আমার দৃষ্টিতে কোনো বিষয়ের সম্ভাব্য সব দিকেই কিছু না কিছু যুক্তি থাকে। অন্যভাবে বললে, যুক্তির নিরিখে সবকিছুই প্রতিসম (counter-balanced)।

তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত নেই কীভাবে?

হ্যাঁ, এখানেই Inference to the Best Explanation বা IBE'র ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তা। কারো কাছে যেটাকে better than any other else or alternative হিসেবে মনে হবে, অন্য কারো কাছে তা নাও হতে পারে। আবার তার কাছে যে অবস্থান বা সম্ভাব্য উত্তরকে বেস্ট মনে হবে, তা যে সবার কাছেই অনুরূপ মনে হবে, বা হতেই হবে, এমন কোনো কথা নাই।

সিদ্ধান্তের এই প্রক্রিয়াটার পোশাকি নাম হলো Abductive Logic or Reasoning।

তো, কেন একেক জনের কাছে একেকটাকে সবচেয়ে ভালো কিংবা একমাত্র ভালো বলে মনে হয়, তার ব্যাখ্যায় এটি, অর্থাৎ IBE সহায়ক। যার যার দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বদৃষ্টি, ঝোঁক-প্রবণতা ও রুচি অনুসারে প্রত্যেকে বিবেচ্য বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে। পূর্ণসচেতন, অথবা অবচেতনে।

তাই, যুক্তিই শেষ কথা নয়। যুক্তিকে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত আমরা আবেগের আশ্রয় নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিরই থাকে একটি একান্ত আবেগের জায়গা। এর গতাস্তর নাই। হতে পারে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের প্যারাডাইম অব থট সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। বা কোনো বিরূপ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে তার এই 'বিরুদ্ধ মনোভাব'কে গোপন কিংবা অস্বীকার করতে চাচ্ছেন।

এই দৃষ্টিতে আবেগই হলো জ্ঞানের উৎস। যুক্তিকে শেষ পর্যন্ত চর্চা করে, অর্থাৎ যুক্তিকে exhaust করে বিশ্বাসে যাওয়া, আর যুক্তিকে বাদ দিয়ে সরাসরি

আবেগনির্ভর ও নির্বিচার বিশ্বাসকে গ্রহণ করা- এই দুইটার পার্থক্যকে মনে রাখতে হবে। প্রথমটা জ্ঞানপদ্ধতি। দ্বিতীয়টা অন্ধবিশ্বাস।

১১ জুলাই, ২০১৯

<https://freethoughts.dorshon.com/combination-of-logic-and-emotion>

বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের দ্বন্দ্ব

(ক) বিজ্ঞান:

- ১। কোনো কিছু সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ শুরু হয় ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হলো বিজ্ঞানের প্রধান হাতিয়ার। অবশ্য ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতামাত্রই বিজ্ঞান নয়, আমরা জানি। মানুষ প্রকৃতিগত কারণেই বিজ্ঞাননির্ভর অর্থে বৈজ্ঞানিক। একে ঠিক সুডো-সায়েন্স বলা যাবে না। সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানপ্রিয়তাকে ফোক-সায়েন্স বলা যেতে পারে।
- ২। জীবন, জগত ও বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা (paradigm of thought) অভিজ্ঞতা লাভের এই প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তা এই ধরনের অভিজ্ঞতা হতে জ্ঞান তৈরির ক্ষেত্রে সবিশেষ ভূমিকা পালন করে।
- ৩। ধর্ম ও দর্শনের তুলনায় বিজ্ঞানের কাজের ক্ষেত্র ক্ষুদ্রতর ও সংকীর্ণ, কিন্তু তুলনামূলকভাবে সুনির্দিষ্ট। যার ফলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হয় অপ্রচলিত ও নিরপেক্ষ ধাঁচের।

(খ) দর্শন:

- ১। দার্শনিক প্রশ্ন-উত্তরের প্রক্রিয়াগুলো শুরু হয় জীবন, জগৎ ও বাস্তবতার মৌলিক প্রশ্নগুলো সম্পর্কে একটি সামগ্রিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে।
- ২। অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় কোনো কিছু পেয়ে গেলে তা জ্ঞানের বিষয় হতে অবনমিত হয়ে তথ্য হিসেবে হাজির হয়। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোকে দর্শন ব্যবহার করে। পাশাপাশি, বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতাগুলোকে দর্শন ছাড়িয়ে যায়।
- ৩। দর্শনের প্রস্তাবনাসমূহ স্বভাবতই বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যে ভরপুর। এর কারণ হলো ইন্দ্রিয় পর্যবেক্ষণের তুলনায় যুক্তিপ্রক্রিয়াটাই স্বয়ং জ্ঞানের কর্তা হিসেবে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপার।

৪। যুক্তি বা আর্গুমেন্ট অধিবিদ্যার দিক থেকে সাবজেক্টিভ হলেও জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে তা অবজেক্টিভ। Arguments are metaphysically subjective but epistemologically objective.

৫। মানুষ মাত্রই দার্শনিক। কেননা, যুক্তি তার হাতিয়ার। এমনকি, যুক্তির বিরুদ্ধেও সে যখন বলে তখনো সে কোনো না কোনো যুক্তিকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

(গ) ধর্ম:

১। ধর্মের ভিত্তি হলো বিশ্বাস। ধর্ম বৃহত্তর পরিসর নিয়ে কাজ করে। ধর্মের আবেদন বিশ্বজনীন বা holistic। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞান সমর্থিত কোনো দার্শনিক প্রস্তাবনাকে সে সঠিক ‘উত্তর’ হিসেবে গ্রহণ করে।

২। নানা ধরনের দৈহিক সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন মানুষ প্রজাতির পক্ষে বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত অবস্থান গ্রহণ করা কী সম্ভব?

৩। সত্যিকার অর্থে, দর্শন ও বিজ্ঞানও এক ধরনের নিজস্ব বিশ্বাসব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে। principle of uniformity of nature (PUN), the future resembles the past তথা inductive প্রসেস, modus ponens সহ এ ধরনের কিছু দার্শনিক প্রপজিশন ছাড়া বিজ্ঞান অচল।

৪। জ্ঞান নিজেই তো এক ধরনের বিশ্বাস। যদিও তা justified এবং true belief। এই জাস্টিফিকেশন ও ট্রুথের বিষয়গুলো মেটাফিজিক্যালি সাবজেক্টিভ বা ব্যক্তিনিষ্ঠ।

৪। ধর্ম হলো এমন বিশেষ ধরনের জীবনব্যবস্থা, যা বিলিফ ও রিচুয়্যাল সিস্টেম আকারে মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। বিজ্ঞান বা দর্শনকে যারা জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে তারা আদতে বিজ্ঞান ও দর্শনকে ধর্ম হিসেবেই মানে। কাশির ঔষধ ফেনসিডিলকে মাদক হিসেবে গ্রহণ করার মতো।

৫। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ধর্মপ্রবণ।

শেষ কথা:

বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের সম্পর্ক ক্রমসোপানমূলক। তাই এগুলোর কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটাকে নিবো, এ ধরনের প্রশ্ন মাত্রই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বা আইদার-অর ফ্যালাসি।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Sarwar Kamal: সবাই কান্টের সুরে এই কথাটি বলছেন যে, আমাদের জ্ঞান শুরু হয় ইন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা দিয়ে। ইন্দ্রীয় তৈরি হওয়ার পূর্বেই মানুষের জীবচেতন্য সৃষ্টি হয়, যার ভিত্তিতে মানুষের জৈবিক ও চেতনাগত বিস্তার ও সম্প্রসারণ ঘটে। একটি ডিম্বাণু বা শুক্রাণুর তো ইন্দ্রীয় নেই, কিন্তু সচেতনভাবেই তা তার পরিপার্শ্বের সাথে সংবেদন বিনিময় করে। ইন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা নয়, বরং ইন্দ্রীয় তৈরি হওয়ার পূর্বেই মানুষ জানতে শুরু করে তার জীবচেতনার বা জীবসত্তার ধর্মগুণে। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান হলো জ্ঞানের একটা বিশেষ পর্যায়, শুরু নয়, শেষও নয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: Correct. What I have said is the popular understanding of the sources of knowledge. Actually, my very personal opinion is that all the sources are actually the same thing from different point of views. Intuition is the basis of everything. Furthermore, knowledge is given..., no matter who has given it. Thanks for the comment good enough for your level of scholarship.

২ ডিসেম্বর, ২০১৭

<https://dorshon.com/science-philosophy-and-religions-inter-relation>

Philosophy starts with science, ends up in religion.

ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক

বিজ্ঞান কাজ করে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। দর্শন কাজ করে যুক্তির ভিত্তিতে। ধর্ম নির্ভর করে বিশ্বাসের উপর।

পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞান কিছু প্রায়োগিক ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নির্মাণ করে। এতে দর্শনের কিছু মৌলিক স্বীকার্যকে সে ব্যবহার করে।

বিজ্ঞানের এসব ফাইন্ডিংসকে নিয়ে দর্শন বৃহত্তর পরিসরে কাজ করে। ফলে, একই বিষয়ে দর্শন নানামুখী তত্ত্ব ও মতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিবেচনার আওতা বা পরিধি যত বাড়ে, ‘প্রমাণ’ তত দুর্বল হয়, যুক্তির প্রয়োজনীয়তা তত বাড়ে। পরিণতিতে বিরোধ তত প্রকট হয়।

তো, দর্শনের এই নানাবিধ বিকল্পের মধ্য হতে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে দার্শনিকরা একটা মত বা তত্ত্বকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে সে এক ধরনের উভয় সংকট ও আত্মবিরোধের মুখোমুখি হয়।

কোনো বিষয়ে বিরোধপূর্ণ বিকল্পের মধ্য থেকে যখন কোনো একটাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তখন সে দর্শনের অবাধ যুক্তিচর্চার নীতিকে ভংগ করে। আবার সেটি না করে নিরপেক্ষ থাকার সুযোগও তার থাকে না।

ফলকথা হলো, কোনো একটা বিশ্বাসব্যবস্থার অধীনতা দিনশেষে তাকে মানতেই হয়। হোক সেটি বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ বা অন্যকিছু।

আমরা জানি, বাদ তথা মতবাদ মানেই এক প্রকারের বিশ্বাসব্যবস্থা। বিশ্বাসব্যবস্থা হতে পারে যুক্তিনির্ভর, হতে পারে নিছক আবেগনির্ভর। আবার, যুক্তিনির্ভর বিশ্বাসব্যবস্থা মাত্রই একই ধারার হবে, এমনও নয়।

একেকটা ধর্ম এক প্রকার স্বতন্ত্র ধারার বিশ্বাসব্যবস্থা। আচার-অনুষ্ঠান বা রিচুয়্যালস হলো উক্ত প্রকার বিশ্বাসব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ।

ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানকে যারা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করায়, তারা black & white বা either-or ফ্যালাসির শিকার। বস্তুত এগুলো একটা আরেকটার পরিপূরক। দর্শন বিজ্ঞানকে কাজে লাগায়। নিজেও উপকৃত হয়। ধর্ম দর্শনকে কাজ লাগায়। আবার নিজেও উপকৃত হয়।

তাই, যারা বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে প্রমাণ বা খণ্ডন করার চেষ্টা করেন, তারা এই ত্রিবিধ ডোমেইন অব নলেজের আন্তঃসম্পর্ককে গুলোয়ে ফেলেন। এ ধরনের হীনমন্যতাসুলভ অপযুক্তি চর্চার মাধ্যমে তারা ধর্ম, বিজ্ঞান বা দর্শনের অপব্যবহারই করেন। যদিও তারা সেটি বুঝতে পারেন না।

অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও বিশ্বাস- এই ধারায় বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের ক্রমসোপানমূলক সম্পর্ককে বুঝার জন্য এই ভিডিও বক্তব্যটা আপনার কাজে লাগতে পারে। একজন মাত্র শ্রোতার সামনে মাস চারেক আগে আধ ঘণ্টার এই ‘বাংলিশ’ একসেন্টের বক্তব্যটা উপস্থাপন করেছিলাম। দেখেন আপনার কেমন লাগে। বুঝতেই পারছেন, আলোচনাটি অনানুষ্ঠানিক। এবং চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক গেরিলা যুদ্ধের অংশ।

ভিডিওটি দেখতে নিচের লিংকটি ব্রাউজ করুন, অথবা পাশের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন:



<https://www.youtube.com/watch?v=SggXxQYauQs>

[আজ সকালে 'ছায়াপথের' ভূমিকা পাতাটি (chayapath.com/about-us) ফেইসবুকে শেয়ার দিতে গিয়ে নিম্নোক্ত ফরোয়াডিংটা লিখেছিলাম। তেমন রেসপন্স দেখলাম না। তাই উপযুক্ত ভিডিও বক্তব্যের অবতারণা। এ বিষয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা আছে।]

“be scientist, not sciencist. say ‘yes’ to science but ‘no’ to sciencism. চাই বিজ্ঞানচর্চা। চাই না বিজ্ঞানবাদিতা। তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্কতা আসলে বিজ্ঞানবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুবাদ-ভাববাদের মতো বিজ্ঞানবাদও একটা দার্শনিক মতবাদ। বিজ্ঞানের মোড়কে বিজ্ঞানবাদ চালিয়ে দেয়া হচ্ছে কিনা, দেখতে হবে। বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মকে যার যার জায়গা হতে বিবেচনা করতে হবে। আমার মতে, এই তিনটার পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমসোপানমূলক তথা mutually dependent and hierarchical.”

৯ আগস্ট, ২০১৭

<https://freethoughts.dorshon.com/science-philosophy-religions-interrelation>

Science, Philosophy and Religion

কোনো বিষয়ে what ধরনের প্রশ্নকে বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে how ধরনের 'উত্তর' দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করে।

কোনো বিষয়ে what ধরনের প্রশ্নকে দর্শন যুক্তির মানদণ্ড দিয়ে why ফরমেটে সমাধান করার চেষ্টা করে। যুক্তির বৈচিত্র্যের কারণে দর্শন কোনো বিষয়ে একক কোনো উত্তর দিতে 'ব্যর্থ' হয়। তৎপরিবর্তে সে সুনির্দিষ্ট কিছু বিকল্প 'উত্তরের' কথা বলে।

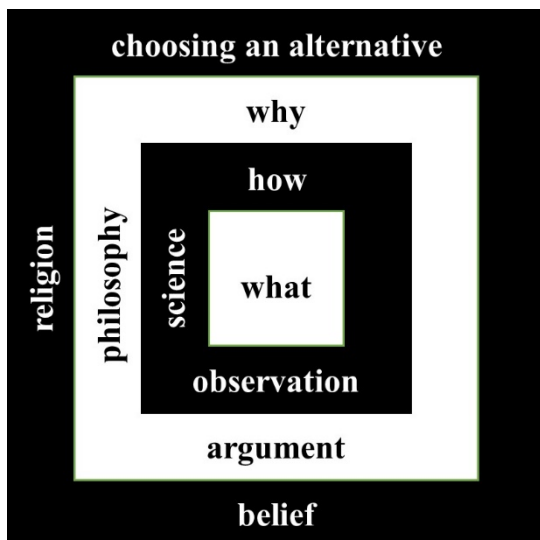
দিন শেষে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হয়।

বৈকল্পিক যুক্তিগুলোর মধ্য হতে ব্যক্তিমানুষ একটাকে 'সঠিক উত্তর' হিসেবে গ্রহণ করে।

এ পর্যায়ে এসে মুক্ত দর্শন গণ্ডিবদ্ধ ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে।

এর গতান্তর নাই।

তাই, দর্শন স্বয়ং মুক্ত স্বভাবের হলেও দার্শনিক তথা ব্যক্তি মাত্রই সুনির্দিষ্ট অবস্থানে নিজেকে চিহ্নিত করতে বাধ্য। হোক সেটা অজ্ঞাতবাদ, সংশয়বাদ বা নৈরাজ্যবাদ।



different approaches of science, philosophy & religion on the what-question

এই জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকটাবস্থার (epistemic predicament) জন্যই দেখা যায়, বিজ্ঞান চর্চাকারীরা অধিকতর অগ্রসর হতে গেলে দর্শনের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে অবশেষে কোনো না কোনো বিশ্বাস-ব্যবস্থার আশ্রয়ে নিজেকে ‘মুক্ত’ ভেবে নির্বাণ লাভ করে ধন্যবোধ করে।

হ্যাঁ, অজস্র শারীরিক, মানসিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিজেকে সঠিক, খাঁটি ও মুক্ত ভাবার জন্য এক কল্যাণদায়ী শুদ্ধ বিশ্বাসই আমাদের ভেতরকার চালিকা শক্তি।

এই দৃষ্টিতে বলতে পারেন, প্রচলিত কোনো কিছুতে অবিশ্বাসও এক ধরনের বিশ্বাস বটে।

বিশ্বাসের নিঃশ্বাস নিচ্ছি বলেই তো আমরা বেঁচে আছি।

বিশ্বাস করুন, ঈশ্বর নয়, স্বর্গ নয়, বিশ্বাস-ব্যবস্থাই ধর্মের সাবর্জনীন পরিচয়।

আলোচনাটির ভিডিও:

www.youtube.com/watch?v=SggXxQYauQs

[স্মার্টফোনে ভিডিওটি দেখতে পাশের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন]



২১ ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১৭

<https://dorshon.com/hierarchical-relation-observation-argument-belief>

বিজ্ঞানের পরিণতি হলো দর্শন, আর দর্শন শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠে ধর্ম

১. বিজ্ঞান থাকতে ফিলোসফি কেন?

আজ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো। সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক। টপিকটি বেশ বর্তমান সময়ের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞান কী?

বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান। পর্যবেক্ষণ ছাড়াও জ্ঞান অর্জনের আরো কয়েকটি উপায় রয়েছে। এর একটা হচ্ছে যুক্তি-বুদ্ধির ব্যবহার বা argumentation। আরেকটি হচ্ছে বিশ্বাসভিত্তিক জ্ঞান। অনেকে মনে করেন, বিশ্বাস ও জ্ঞান হচ্ছে পরস্পরের সাথে সম্পর্কহীন ও পরস্পর বিপরীত দুইটা বিষয়। যারা এটা মনে করেন, তারা এটাও মনে করেন যে জ্ঞান হলো প্রমাণনির্ভর কিছু। বিশ্বাস প্রমাণনির্ভর নয়।

পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিতে, জ্ঞান হচ্ছে যাচাইকৃত সত্য বিশ্বাস। তাই জ্ঞান মাত্রই এক প্রকার বিশ্বাস। তবে বিশ্বাসমাত্রই জ্ঞান নয়। কোনো বিশ্বাসকে জ্ঞান হতে হলে সেই বিশ্বাসকে হতে হয় সত্য ও যাচাইকৃত বা যাচাইযোগ্য।

বিশ্বাস হলো জ্ঞানের অন্যতম অপরিহার্য উৎস।

জ্ঞান হলো কোনো অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ফলাফল বা পরিণতি। জ্ঞান কগনিটিভ এজেন্সী নিয়ে কাজ করে। কগনিটিভ এজেন্ট কে? সোজা কথায় এই প্রশ্নের উত্তর হলো, কগনিটিভ এজেন্ট হচ্ছে সে যার প্রশ্ন আছে। যে প্রশ্ন করে। জানতে চায়। নিজের মতো করে।

বইয়ের কোনো প্রশ্ন আছে বলে আমরা মনে করি না, যদিও বইয়ে অনেক প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা থাকে। পানির গ্লাস, টেবিল কিংবা গাছেরও কোনো প্রশ্ন নেই। অন্ততপক্ষে আমরা তা জানি না। তাই, যখন আমরা জ্ঞান কিংবা কগনিটিভিটির কথা বলি, তখন আসলে আমরা মানুষের কথাই বলি।

একমাত্র মানুষেরই নানা বিষয়ে প্রশ্ন থাকে। সেই প্রশ্ন সঠিকও হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে।

উত্তরের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। উত্তর সঠিক কিংবা ভুল, দুটার যে কোনোটাই হতে পারে। আবার, এমনটিও হতে পারে, হয়তো সেই প্রশ্নটিই ভুল বা অযৌক্তিক। একজন ব্যক্তির কগনিটিভ এজেন্ট হবার প্রমাণ হচ্ছে, কোনো না কোনো বিষয়ে তার প্রশ্ন ও অনুসন্ধিৎসা থাকা। বিশেষ ধরনের কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার জন্য আমরা পর্যবেক্ষণের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করি।

আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জ্ঞান থেকে শুরু করে দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞান এভাবেই শুরু হয়।

বস্তুজগত সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে বিজ্ঞান ‘what’ প্রশ্নকে ডিল করতে গিয়ে ‘how’ ফরম্যাটে সেটার উত্তর দেবার চেষ্টা করে।

বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা আসলে আমাদের সামনে তাদের কিছু পর্যবেক্ষণ এবং সেগুলোর ফলাফল তুলে ধরে। সেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তারা কোনো কিছু সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রদান করেন। একজন বিজ্ঞানী বা গবেষক যা জানে তা আসলে পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফল ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণই হচ্ছে মূলভিত্তি।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যেভাবে ‘what’ প্রশ্নের মাধ্যমে আগায় এবং ‘how’ ফরম্যাটে উত্তর দেবার চেষ্টা করে, দর্শন কিন্তু সেভাবে কাজ করে না। দর্শন ‘what’ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করে ‘why’ ফরম্যাট অনুসরণ করে। কোনো কিছু কীভাবে হলো সেটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কোনো কিছু ‘কেন’ হলো, কেন অন্যরকম না হয়ে সেরকমই হলো, দর্শন সেইটা বুঝার চেষ্টা করে। এ কাজ করতে গিয়ে দর্শন কিন্তু বিজ্ঞান দ্বারা অনুসৃত ‘how’ ফরম্যাটকে অবহেলা ও অগ্রাহ্য করে না, কিংবা বাতিল করে দেয়না।

দর্শন নিয়ে অনেকের মাঝেই একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে, দর্শন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে খাটো করে দেখে কিংবা সন্দেহের চোখে দেখে। আসলে তা নয়।

প্রকৃতপক্ষে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে দর্শন প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি বিজ্ঞানের আওতাকে ছাড়িয়ে যায়। একটা পর্যায়ে গিয়ে স্বভাবতই বিজ্ঞান থেকে জ্ঞানগত শাখা হিসেবে দর্শন নিজেকে স্বতন্ত্র করে নেয় এবং নিজের মতো করে জীবন ও জগতকে জানার চেষ্টা করে। দর্শনের এই স্বাভাবিক্যে অনেকে ভুল বুঝে।

তারা মনে করে, ‘আমার কোনো পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন নেই, কোনো প্রক্রিয়া অনুসরণের প্রয়োজন নেই, আমি শুধু ভাববো আর চিন্তা করবো। এটাই দর্শন।’ কিন্তু না, এটা আসলে দর্শন নয়।

কোনো বিষয় বা টপিক নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষক, বিশেষজ্ঞ বা বিজ্ঞানীরা কী বলে সেটা সার্বিকভাবে জেনে নেয়াটা হলো দর্শনের প্রথম কাজ। এর পরের ধাপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো মৌলিক প্রশ্নকে মোকাবেলার করার দিকে দর্শন এগিয়ে যায়। সেই বিষয় বা টপিকটিকে আরো বৃহত্তর বা সূক্ষ্মতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করে। এভাবে দার্শনিকরা কোনো বিষয়ের গভীরে যাবার চেষ্টা করে। এভাবেই তারা জ্ঞানের পরবর্তী ধাপে উপনীত হয়। তারা কোনো বিষয়ের একদম গোড়ার প্রশ্ন নিয়ে অনুসন্ধান করে। যেমন: এটা কেন হলো? এরকমই কেন হলো? ইত্যাদি।

how, or why?

কোনো বিষয় নিয়ে ‘how’ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হলে কখনই ‘why’ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। দর্শন তাই ‘why’ নিয়ে কাজ করে। আর এ প্রক্রিয়ায় কাজ করতে গিয়ে দর্শন আমাদের সামনে অনেকগুলো বিকল্প উত্তর উপস্থাপন করে। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একই ডাটা বা তথ্য অনুসরণ করে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব, বিপরীতধর্মী, এমনকি পরস্পরবিরোধী তত্ত্বও গড়ে উঠতে পারে। একই পর্যবেক্ষণের আলোকে পরস্পরবিরোধী যুক্তি বা দাবির উঠে আসতে পারে।

দর্শন সবসময় যুক্তি ব্যবহার করে।

কগনিটিভ এজেন্ট হিসেবে আমরা যুক্তির মাধ্যমেই কোনো কিছুর সম্ভাব্যতা কিংবা গ্রহণযোগ্যতা বিচার করি। বৃহত্তর বা সূক্ষ্মতর যেই লেভেলে দর্শন কাজ করে সেই লেভেলে পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই, যুক্তিই সেখানে একমাত্র হাতিয়ার আর বাহন হিসেবে কাজ করে।

তাই যুক্তির মাধ্যমেই দর্শন জীবন ও জগত সম্পর্কে আমাদের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে।

দর্শন এমন একটি বিষয় যেটি কোনো প্রশ্নের জবাবে আমাদেরকে শুধু একটিমাত্র উত্তর প্রদান করে না। বরং, বিভিন্ন ধাঁচের যুক্তির ধারায় আমাদের সামনে কয়েকটি বিকল্প উত্তর উপস্থাপন করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন রকম। যে উত্তর বা ব্যাখ্যা পর্যবেক্ষণ দ্বারা সবচেয়ে বেশি সমর্থিত হয়, সেটাকেই তখনকার বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় সঠিক হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

বলাবাহুল্য, যুক্তি কখনো একক ধাঁচের বা চরিত্রের হয় না। দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হলে একই বিষয়ে যুক্তিও ভিন্ন হবে। তাই, কোনো বিষয় বা প্রশ্নে দর্শন অনেকগুলো বিকল্প উত্তর হাজির করার মাধ্যমে প্রতিটি উত্তরের সবলতা ও দুর্বলতাগুলোকে সমভাবে তুলে ধরে।

প্রশ্ন হতে পারে, যুক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিসম (counter-balanced) পরিস্থিতিতে তো প্রতিটি উত্তর বা অপশনের সমর্থনেই যুক্তি পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে মানুষ কোন উত্তর বা অপশনটি বেছে নিবে?

প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে, তার কাছে যে যুক্তিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় সেটি বেছে নেওয়া। ব্যক্তি কিংবা দার্শনিক হিসেবে আমরা যুক্তির ভিত্তিতেই কোনো অপশনকে প্রেফার করি বা বেছে নেই। যদিও আমি জানি, অন্যরা যে অপশন বেছে নিয়েছে, সেটির পক্ষেও যুক্তির সমর্থন আছে। যদিও আমার দৃষ্টিতে তা দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

বৈকল্পিক পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের পছন্দের অপশনটিকে বেছে নেয়ার কারণ হলো, এটাই আমাদের কাছে একমাত্র সঠিক অপশন কিংবা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উত্তর বলে মনে হয়েছে। আমরা যখন এভাবে কোনো একটি অপশনকে বেছে নেই, তখন ঠিক কোন শক্তি আমাদেরকে সেই অপশনটা গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে? কোন জিনিসটার কারণে আমরা বিশেষ এই অপশনটাকেই একমাত্র সঠিক অপশন বলে মনে করি?

অ্যাবডাঙ্টিভ লজিকের ভাষায়, আমরা এটাকে ‘সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকে বেছে নেওয়া’ বা ‘Inference to the best explanation (IBE)’ বলে থাকি। অনেকগুলো অপশন বা দার্শনিক ব্যাখ্যা থেকে যার যার বিবেচনা মোতাবেক আমরা একেকজন একেকটা অপশন বা ব্যাখ্যাকে বেছে নেই বা নিতে বাধ্য হই।

আমরা সবাই যদিও একই পৃথিবীতে বাস করি, প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করি, তবুও আমাদের চিন্তাধারা, মতাদর্শ, দার্শনিক অবস্থান প্রভৃতি ব্যক্তিভেদে আলাদা, বিপরীতধর্মী, এমনকি পরস্পরবিরোধীও হয়ে থাকে। ওয়ানস এগেইন, এটা কেন হয়?

কোনো একটি প্রশ্নের উত্তরে দর্শন কেন একটিমাত্র উত্তর প্রদান করে না?

আমরা জানি, দার্শনিক উত্তর মাত্রই অন্তর্গতভাবে অমীমাংসিত বা প্যারাডক্সিক্যাল। philosophical problems are perennial and philosophical propositions are paradoxical in its true nature. এর মানে হচ্ছে, যুক্তির দিক থেকে সব উত্তরই প্রতিসম বা সমান। ব্যক্তির ইনটেনশন বা নিয়তই ঠিক করে, কোনটাকে সে সঠিক বা ‘প্রমাণ’ হিসেবে গ্রহণ করবে।

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। যুক্তি-বুদ্ধি তার হাতিয়ার। কোনো কিছু বলার সময়ে আমরা কোনো না কোনো যুক্তি দিয়েই তা বলার চেষ্টা করি। আমরা এটাও দেখি, অন্য কেউ সেই একই যুক্তি ব্যবহার করে হয়তো এমন কিছু বলছে যেটা আমার (দার্শনিক) অবস্থানের বিপরীত। এমনকি সে এই যুক্তি দিয়েই হয়তো আমার অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করছে, এমনকি বাতিলও করে দিচ্ছে।

দর্শনের এই পিকিউলিয়ার এন্ড প্যারাডক্সিক্যাল বৈশিষ্ট্য মানবজাতির জন্য আশির্বাদ।

নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কোনো কিছু বেছে নেবার সুযোগ দর্শন আমাদেরকে দিচ্ছে। দর্শনের কারণেই আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কোনো কিছু বেছে নিতে পারি, নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। ফিলোসফির অনুপস্থিতিতে আমরা রোবট হয়ে যেতাম। কিংবা হতাম অবলা প্রাণী, অথবা কাঠ, পাথর, জড়।

প্রশ্ন হতে পারে, দর্শনে তো আমরা পর্যবেক্ষণ এবং যুক্তি- এ দুটি ব্যবহার করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তাহলে কেন আমরা দিনশেষে অনেকগুলো অপশন থেকে একটি অপশনকেই বেছে নেই? পূর্বেই বলেছি, এটা আসলে আমাদের মানসিকতা বা এটিচুডের পার্থক্যের কারণে। যেটাকে জ্ঞানতত্ত্বে ‘belief’ বা বিশ্বাস হিসেবে অভিহিত করা হয়। কোনো কিছু সঠিক হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে আমাদের বিশ্বাসই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। এর উপর ভিত্তি করেই আমরা অনেকগুলো অপশন থেকে একটাকে বেছে নেই।

যে বিশ্বাসের পেছনে পর্যবেক্ষণ কিংবা যুক্তির কোনো সমর্থন থাকে না সেই বিশ্বাসকে বলা হয় ডগম্যাটিক বিলিফ বা অন্ধবিশ্বাস। আর যে বিশ্বাসের পেছনে পর্যবেক্ষণ এবং যুক্তির সমর্থন থাকে সেই বিশ্বাসকে ‘জ্ঞান’ হিসেবে ধরা হয়।

অতএব, প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের জন্য বিজ্ঞান অপরিহার্য।

তবে, ‘what’ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য বিজ্ঞান যেহেতু ‘how’ প্রক্রিয়াতে অগ্রসর হয় সেহেতু এটাকে আমরা চূড়ান্ত হিসেবে ধরে নিতে পারি না।

কগনিটিভ এজেন্ট হিসেবে আমরা নানান বিষয় নিয়ে চিন্তা করি। কোনো বিষয়ে দুয়েকটা উত্তর পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাই না। এটা কেন, ওটা কেন, এটা এ রকম কেন, ও রকম নয় কেন— এ রকম নানা ধরনের প্রশ্ন আমাদের মনে সবসময় উঁকি দেয়। এভাবেই আমরা আসলে কোনো প্রশ্নের কেন'র উত্তর খুঁজে পেতে চাই। হোয়াই ফরফ্যাটে তথা কেন'র উত্তর পাওয়ার জন্য স্বভাবতই আমরা যুক্তিচর্চা তথা দর্শনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হই।

২. ইসলামের মূল প্রস্তাবনা হলো পিউর অ্যান্ড কোর ফিলোসফি

যারা ফিলোসফি বোঝে না, সেটি তাদের সমস্যা। ইসলাম ও দর্শনের সম্পর্ক নিয়ে আমার কিছু লেখা আছে। এখানে তাই দ্বিরুক্তি এড়িয়ে এ বিষয়ে নতুন করে কিছু বলতে চাচ্ছি।

আগেই বলেছি, দর্শন কিন্তু কোনো প্রশ্নের উত্তরেই আপনাকে একটিমাত্র অপশন বা উত্তর প্রদান করবে না। বরঞ্চ, দর্শন আপনাকে একটি সঠিক উত্তর খুঁজে পেতে সহায়তা করবে এবং পাশাপাশি আপনাকে বিকল্প অপশন বা উত্তরগুলোও দেখিয়ে দিবে।

তবে, দর্শন আমাদেরকে যে বিকল্প অপশনগুলো প্রদান করে সেগুলো অসীম সংখ্যক হবে না। বরং সীমিত। কারণ, যুক্তির ভিত্তা থাকলেও মানবীয় যুক্তির মৌলিক কাঠামো ভিত্তিগতভাবে সুনির্দিষ্ট এবং উপরি পর্যায়ে তা একটা নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে সীমায়িত।

সীমিত কয়েকটি অপশনের মধ্যে যে কোনো একটি অপশন বেছে নিতে হয়, এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে, অন্য কোনো অপশন না নিয়ে আমরা কেন একটি বিশেষ অপশনকেই বেছে নেই? কোন শক্তির সাহায্যে বা প্ররোচনায় আমরা এটা করে থাকি?

এই প্রশ্নের একমাত্র গ্রহণযোগ্য উত্তর হলো, এক্ষেত্রে ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর হলো আমাদের বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো অপশন বেছে নেবার জন্য জীবন ও জগত সম্পর্কে আমাদের ইনস্টিংক্টিভ বেসিক প্যারাডাইম বা অন্তর্গত মৌলিক জীবনবোধ— যাকে আমরা এক কথায় বিশ্বাস বলি, তা মূল ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বাসই আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে। বিশ্বাসই জ্ঞানগত সিদ্ধান্তের মূল নিয়ামক।

আমরা জানি, বিশ্বাস থেকেই ধর্মের উৎপত্তি।

যে কোনো ধর্মের মূলে রয়েছে বিশ্বাস। তবে একটি প্রচলিত ভুল ধারণা হলো— বিশ্বাস হচ্ছে এমন কিছু, যেটার জন্য কোনো পর্যবেক্ষণ কিংবা যুক্তির প্রয়োজন নেই। এই ধারণাটি সত্য নয়।

আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আমরা যদি এই বিষয়গুলোর সাথে ইসলামের তুলনা করি তাহলে দেখবো, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা তোমাদের চারপাশের ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করো।

এই যে আকাশ, বাতাস, চাঁদ, সূর্য, পাখি, বৃক্ষ, ফলমূল— এ সবগুলোই তো আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা জানি, কোরআনের বেশিরভাগ সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কী যুগের ইসলামে শরীয়ত বা তেমন কোনো বিধিবিধান ছিলো না। তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের মতো মৌলিক বিষয়গুলোই তখন ইসলামে ছিলো। নবুয়তের দশম বছরে মহানবী (সা.) মেরাজে গমন করেন। সেখানে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের আদেশ লাভ করেন।

মক্কী যুগে অপশনাল রোজা ও শেষের দিকে নামাজের মতো অল্প কয়েকটি বিষয় ছাড়া আর তেমন কোনো কিছুই বাধ্যতামূলক ছিলো না।

তাহলে, মক্কী যুগে মুসলমান হওয়া সাহাবীদেরকে কেন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষ হিসেবে মনে করা হয়? সেটা তাদের বুঝজ্ঞান এবং ঈমান ও আকীদায় দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই। তাওহীদ, রেসালাত এবং আখিরাতের মতো ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো। তাওহীদ, রেসালাত এবং আখিরাতের আলোচনায় কোরআনে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্যবার মানুষের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এরপর তিনি যুক্তি প্রদান করেছেন।

ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসেবে এই ধর্ম সম্পর্কে আমার বুঝজ্ঞান বেশ ভালো বলেই আমি বিশ্বাস করি।

ঈমান এবং আকীদার মতো ইসলামের মৌলিক বা কোর বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের দার্শনিক সমাধান বা kind of philosophical outcome। পরম সত্য আছে কিনা, না থাকলে এই প্রশ্নটা আমাদের মনে আসে কেন? থাকলে তা আমরা কোথায় ও কীভাবে পাবো? বাস্তবতা আসলে কী? পরম বাস্তবতা বলে আসলে কি কিছু আছে?

এ ধরনের প্রশ্নগুলোর এক ধরনের উত্তর হচ্ছে তাওহীদ বিশ্বাস বা mono-theism। তাওহীদ বিশ্বাস অনুযায়ী, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র পরম বাস্তব। তিনি না থাকলে এ পৃথিবীর অস্তিত্ব লাভ হতো না।

সৃষ্টিকর্তা একজন নাকি বহু, সৃষ্টিকর্তা আছেন কিনা, অথবা তিনি অবতার হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন কিনা— এসব প্রশ্নের উত্তরে ইসলামের নিজস্ব একটি অবস্থান রয়েছে। সেটা হচ্ছে— সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর আছেন। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নাই।

এইগুলো আসলে একেকটা মেটাফিজিক্যাল বা অধিবিদ্যক ইস্যু।

ঈশ্বর পৃথিবীতে ওহী নাযিল করেছেন মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য— এটাও আসলে ফিলোসফিক্যাল বিষয়। ঈশ্বর যদি থেকে থাকেন, তাহলে মানুষ কীভাবে তাঁর সাথে সম্পর্কিত হবে, কীভাবে তাঁর কাছ হতে হেদায়েত লাভ করবে, তা নিয়ে ইসলাম যা বলে সেটাকে আমরা নবুয়তের ধারণা হিসেবে জানি।

‘প্রকৃতির সন্তান’ হিসেবে মানুষ তৈরি করেছে এই অর্থে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে প্রাকৃতিক ফেনোমেনা বা প্রকৃতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করলে এবং শরীয়তকে প্রকৃতিসম্মতভাবে জীবন পরিচালনার গাইডলাইন হিসেবে ধরলে আমরা বলতেই পারি, নবুয়তের ধারণা হলো এক ধরনের সামাজিক দর্শন।

এই ধারার বিশ্ব-দর্শন বা প্যারাডাইম অনুসারে ঈশ্বর হচ্ছেন প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা। যারা ফিলোসফি বোঝেন, উত্তর বা প্রস্তাবিত সমাধানের সাথে একমত হোন বা না হোন, তারা বুঝেন যে এই সকল প্রশ্ন ও বিষয় আসলে খাঁটি ফিলোসফিক্যাল কোয়েশ্চন ও ইস্যু। দর্শনের মূল শাখা হচ্ছে মেটাফিজিক্স। আর এগুলো তো মেটাফিজিক্সেরই প্রশ্ন। এই মেটাফিজিক্যাল প্রশ্নগুলোর কিছু সুনির্দিষ্ট উত্তর ইসলাম আমাদেরকে দেয়।

এ কাজে ইসলাম জ্ঞানতত্ত্বের প্রচলিত পদ্ধতিতেই অগ্রসর হয়। যেমন, জ্ঞান অর্জন ও যাচাইয়ের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর সহায়তা নেয়। যখন যেখানে যেটা প্রযোজ্য হয় বা হতে পারে তখন সেখানে সেটার সাপোর্ট নেয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তা হতে পারে অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি বা স্বজ্ঞা বা সাক্ষ্য কিংবা অথরিটি।

ইসলামের বাইরেও ফিলোসফিতে আমরা এই প্রশ্ন ও ইস্যুগুলোর আরো কিছু বিকল্প সমাধান বা উত্তর দেখতে পাই। অটোনোমাস কগনিটিভ এজেন্ট বা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আমি এভেইলেবল উত্তরগুলোর মধ্য কোনো একটিকে গ্রহণ করি। প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কেন সেই অপশনটাই বেছে নেই? আমি বিশ্বাসীই বা কেন?

‘আমি বিশ্বাস করি, তাই বিশ্বাসী, কোনো প্রকার কারণ ছাড়াই, এটা আমার কাছে ভালো মনে হয়, সুতরাং এটা ভালো’— অনেকে এ রকম চিন্তা করে। অনেক ধার্মিক

ব্যক্তিও এরকম চিন্তা করে থাকেন। আমার দৃষ্টিতে এটি অগ্রহণযোগ্য, ধর্মবিরোধী ও বোকামীসুলভ অন্ধ চিন্তা।

নিজের ব্যাপারে বলতে পারি, একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে আমি বিশেষ করে ইসলাম ধর্মকে অনুসরণ করার কারণ হলো, আত্মসত্তা, জীবন ও জগত সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণ ও অনুমান আমাকে বাধ্য করে বিশেষ কিছু যুক্তিকে গ্রহণ করতে। শক্তিশালী ‘why’ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য একটি সঠিক ও সুস্পষ্ট উত্তর বেছে নেয়ার কাজে আমার পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা আমাকে পথ দেখায়।

অন্য কোথাও আমি আমার ‘why’ প্রশ্নের উত্তর পাই না। আমি যখন কোরআন পড়ি, ওহী সম্পর্কে ধারণা লাভ করি, মহানবীর (সা.) জীবন সম্পর্কে জানি; তখন আমার কাছে সেগুলো সঠিক, গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। এ কারণেই আমি ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করি।

এবার আসুন, ‘বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্ম’ নিয়ে আলোচনার সারাংশ আলোচনা করা যাক।

৩. দর্শন কীভাবে বিশ্বাসব্যবস্থা বা ধর্ম হয়ে উঠে

how philosophy ends up in belief system or religion

বিজ্ঞান কাজ করে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে। পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে যুক্তির দিকে নিয়ে যায়। আর যুক্তি তখনই সিদ্ধান্ত অথবা জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হয় যখন সেটা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বা বিশ্বাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠে।

পর্যবেক্ষণ, যুক্তি এবং বিশ্বাস— এ তিনটি বিষয়ের সমষ্টিই হচ্ছে জ্ঞান। এটি সমকালীন পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের কথা বা agreed point।

কিন্তু একই বিষয় পর্যবেক্ষণের পরও বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করতে পারে। আর মানুষের সহজাত দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার মাত্রাও এক নয়। আবার একেক ব্যক্তির মন-মানসিকতাও একেক রকম। এ কারণে বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিভেদে পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। এ কারণেই দর্শনের জগতে এত আইটেম। আপনি যদি কোনো একটা রেসিপিতে পরিবর্তন আনেন, তাহলে নতুন আইটেম তৈরি হবে।

আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মসত্তা, জীবন ও জগত নিয়ে বিশেষ কিছু দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কোনো কিছু পর্যবেক্ষণের পর আমরা সেটা নিয়ে সে ধরনের যুক্তিই প্রদান করি যেগুলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে যায়। আর সে কারণে একই বিষয়ে

একেকজনের জ্ঞানও হয় একেক রকম। আমার জ্ঞানের সাথে আপনার কিংবা অন্য কারো সাথে আমাদের জ্ঞানের মিল হতেও পারে, নাও হতে পারে।

একই পৃথিবীর আলো বাতাসে থেকেও আমাদের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা ও বৈপরিত্য। আবার, একই বিষয়ে একেকটি ডিসিপ্লিন আমাদেরকে একেক রকম জ্ঞান দান করে। ধর্মও সেরকম একটা ডিসিপ্লিন। ধর্মের ক্ষেত্রে, একেক জনের মতামত একেক রকম হওয়া বা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক।

আপনি যদি দর্শনের কথা বলেন, এক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অপশন খুবই সীমিত। প্রতিটি ধাপেই আপনাকে যুক্তির সাহায্যে এগুতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনার অপশন আরো বেশী সীমিত। কারণ, সবকিছু আপনাকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে।

যারা নিজেদেরকে ‘বিজ্ঞানমনস্ক’ দাবি করে থাকেন, আমি তাদেরকে বলি বিজ্ঞানবাদী বা scienceist। তারা, মানে বিজ্ঞানবাদীরা যুক্তি দেন, ‘বিজ্ঞান আমাদেরকে খুব সুনির্দিষ্ট উত্তর দেয়, কোনো বিষয়ে এটা যে উত্তর প্রদান করে সেটাতে ততটা মতপার্থক্য দেখা যায় না, যতটা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায়। সুতরাং, আমাদের উচিত বিজ্ঞানকেই চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করা।’

হ্যাঁ, বিজ্ঞান আমাদেরকে খুব সুনির্দিষ্ট উত্তর দেয়, এটা সত্যি। তবে এর কারণ হচ্ছে, বিজ্ঞান আসলে খুব সীমিত পরিসরে কাজ করে। কোনো কিছু ‘কীভাবে’ ঘটে বিজ্ঞান সেটা নিয়ে কাজ করে। আর এক্ষেত্রে বিজ্ঞান সাহায্য নেয় পর্যবেক্ষণের। কিন্তু, আমরা যখন কোনো কিছু ‘কেন’ ঘটে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে চাই তখন সে প্রশ্নটির সদুত্তর প্রদান করা বিজ্ঞানের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর কারণ হচ্ছে, ‘why’ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সাবজেক্টিভিটির দরকার হয়। প্রয়োজন হয় যুক্তির। উপযুক্ত যুক্তিকে খুঁজে নিয়ে তা গ্রহণ করতে হয়।

আর যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ, এ দুটি এক বিষয় নয়। যদিও এ দুটি বিষয় মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বা কন্ট্রাডিক্টরিও নয়। তবে, আলাদা বিষয়।

যুক্তির পরিসর অনেক বিস্তৃত।

আর সে কারণেই যুক্তি আমাদেরকে অনেকগুলো অপশন প্রদান করে। কগনিটিভ এজেন্ট বা মানুষ হিসেবে আমরা একইসাথে সব অপশনকেই গ্রহণ করে নিতে পারি না। বিদ্যমান অপশনগুলো থেকে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হয়। আপনি হয়তো বলতে পারেন, ‘আমি অপশনগুলোর কোনোটাই গ্রহণ করবো না।’ এক্ষেত্রেও

কিন্তু আপনি একটি অবস্থান গ্রহণ করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন, যেটাকে আমরা বলি ‘নিহিলিস্টিক’, ‘এগনস্টিক’ কিংবা ‘স্কেপটিক’ অবস্থান।

কোনো জোটেই যদি আপনি না থাকেন তাহলে আপনি জোটনিরপেক্ষ জোটের সদস্য।

সংগত কারণেই, জীবন ও জগতের রহস্য উন্মোচনের কাজে বিজ্ঞানের চাইতে দর্শনের পরিসর অধিকতর বিস্তৃত। বিজ্ঞানের তুলনায় দার্শনিক মত বা বিকল্প বেশি। আবার দর্শনের চেয়ে ধর্মের পরিসর ও প্রদত্ত অপশন আরও বেশি। কোনো অপশন গ্রহণ করার জন্য দর্শন আমাদেরকে পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করে না। বরং, আপনি যদি কোনো একটি অপশনকে চাপিয়ে দেন বা কাউকে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য করেন, তাহলে আপনি আসলে দর্শনের শিক্ষার বিপরীত কাজটিই করলেন।

এর কারণ হচ্ছে, দার্শনিক কোনো আলোচনায় আপনি সম্ভাব্য এমন কোনো কিছুকে বাদ দিতে পারেন না, যা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত। হোক তা আপনার দৃষ্টিতে দুর্বল যুক্তি। যে কোনো ফিলোসফিক্যাল ইস্যুর জন্য এটি প্রযোজ্য।

ফিলোসফিতে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে অনেকগুলো গ্রুপ, পয়েন্ট, স্কুল বা ধারা ও থিওরি থাকে। সবগুলোর পেছনে বা সমর্থনেই থাকে নিজ নিজ প্যাটার্নের যুক্তি।

দার্শনিক হিসেবে কেউ যদি অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) হয়ে থাকে, তাহলে তিনি স্বভাবতই বুদ্ধিবাদীদের যুক্তিগুলোকে বাতিল করে দিবেন। একইভাবে কেউ যদি বুদ্ধিবাদকেই (rationalism) বেশি ভালো মনে করে, তাহলে তিনি অভিজ্ঞতাবাদকে বাতিল করে দিবেন। কিন্তু, দর্শনের ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে আমি জানি, দর্শনের প্রতিটি অপশনের পক্ষেই যুক্তির সমর্থন রয়েছে।

গোঁড়ামিমুক্ত, অবাধ ও স্বাধীন জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যকেই আমরা আসলে অগ্রাঘ্য (violate) করি যখন আমরা একজন ব্যক্তি বা দার্শনিক হিসেবে দিনশেষে বিশেষ কোনো একটি অপশনকেই বেছে নেই। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, আসলে আমাদেরকে অবশেষে সেটাই করতে হয়। কারণ, কোনো একটি বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট অবস্থানকে করণীয় বা অনুসরণীয় হিসেবে বেছে নেওয়া ছাড়া আপনি অগ্রসর হতে পারবেন না।

আপনি দর্শনের ক্লাসে বিভিন্ন অপশন নিয়ে কথা বলতে পারেন, সেগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমালোচনা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, বিকল্প অপশন দেখাতে পারেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত একজন মানুষ হিসেবে আপনি অবশ্যই কোনো না কোনো অপশন বেছে নিয়ে কোনো একটি পার্টিকুলার অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য। তেমনিভাবে আপনার শিক্ষার্থীরাও কোনো না কোনো অবস্থানের সাথে অবশেষে

নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে বাধ্য। বাস্তব জীবনে যেহেতু আমরা নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না।

ট্রাজেডিটা হলো, এ রকম সুনির্দিষ্ট একটি অবস্থান গ্রহণ করার মাধ্যমে আসলে আমরা অবাধ, স্বাধীন, গোঁড়ামিমুক্ত ও নিরপেক্ষ জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে দর্শনের যে বৈশিষ্ট্য সেটাকেই কার্যত বাতিল বা অগ্রাহ্য করি। আমরা কেন এটা করি? এই প্যারাডক্স বা ডিলেমার সমাধানই বা কী?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করলে আপনি বুঝবেন, আসলে মানুষ হিসেবে আমাদের কগনিটিভিটির মূলে রয়েছে বিশ্বাস তথা স্বতঃপ্রণোদিত বা অন্তর্গত ইচ্ছাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির অনস্বীকার্য ভূমিকা। এগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমাদের স্বতন্ত্র জ্ঞানজগত বা cognitivity গড়ে ওঠে। আর তাই, জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা তথা জ্ঞান-দাবির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বাসকে কোর আইডেন্টিফায়ার ও জাস্টিফায়ার হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

৪. সমকালীন পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে বিশ্বাস হলো জ্ঞানের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ

সবশেষে আমি আপনাদের খুব চমকপ্রদ একটি তথ্য দিতে চাই। ‘belief’ বা ‘বিশ্বাস’ শব্দটি জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত বই কিংবা লেখায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ। আপনি যেখান থেকে ইচ্ছা জ্ঞানতত্ত্বের একটি বই বা আর্টিকেল নিয়ে ‘belief’ লিখে সার্চ দেন, তাহলে দেখবেন, এই শব্দটি বহুল ব্যবহৃত শব্দের একদম শীর্ষেই রয়েছে।

তবে, জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে দর্শনের অনেক শিক্ষার্থী, এমনকি শিক্ষকরাও ততটা সচেতন নয়। বিশেষ করে যারা সমকালীন জ্ঞানতত্ত্ব পড়ে নাই।

পুনশ্চ, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ধর্ম গড়ে ওঠে। সেই বিশ্বাস ডগম্যাটিকও হতে পারে, আবার পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিবোধের সমর্থন নিয়েও হতে পারে। কোনো বিশ্বাস যখন পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য বিশ্বাস তথা জ্ঞান উৎপাদকারী বিশ্বাস বা knowledge making belief।

‘জ্ঞান হচ্ছে যাচাইকৃত সত্য বিশ্বাস’- এই কথাটি এক শিষ্যকে প্লেটো প্রায় ২০০০ বছর আগে বলে গেছেন।

১৯৬৩ সালে এডমন্ড এল গেটিয়ার ‘Is justified true belief knowledge? (যাচাইকৃত সত্য বিশ্বাস মাত্রই কি জ্ঞান?)’ শিরোনামে তিন পৃষ্ঠার একটি ছোট আর্টিকেল লিখেন। সেখানে তিনি এটা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে কিছু বিষয় ভাগ্যক্রমেও সত্য হয়ে যেতে পারে। যাচাইকৃত সত্য বিশ্বাস তথা JTB-তত্ত্ব

অনুসারে সেই ভাগ্যানুমান বা lucky guess-ও কারো কাছে ভুলক্রমে জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যদিও আমরা জানি, যথার্থভাবে যাচাই করা ছাড়া নিছক অনুমাননির্ভর কোনো ‘জ্ঞান’ প্রকৃত জ্ঞান হতে পারে না।

তাহলে এর সমাধান কী?

JTB-র প্রস্তাবনাকে সঠিক করার জন্য অনেক প্রস্তাবনাই দেওয়া হয়েছে। তবে, জ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিকেরা একমত হতে পারেন নাই। গেটিয়ারের প্রশ্নটির মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে সমকালীন জ্ঞানতত্ত্বের যাত্রা শুরু হয়েছে। যদিও জ্ঞানতত্ত্ব বা জ্ঞানের যাত্রা আসলে তখন থেকেই শুরু হয়েছে যখন মানব সভ্যতার উন্মেষ তথা মানুষ ফিলোসফি চর্চা শুরু করেছে।

‘ফিলোসফি’ শব্দটার ভিত্তিই জ্ঞান। আমরা জানি, দুটি গ্রীক শব্দ থেকে ‘ফিলোসফি’ শব্দটি এসেছে। একটি হচ্ছে, ‘ফিলোস’ (philos) এবং আরেকটি হচ্ছে ‘সোফিয়া’ (sophia)। এগুলোর অর্থ করলে দাঁড়ায় জ্ঞানের জন্য ভালোবাসা।

চিন্তাবিদ হিসেবে যাদেরকে আমরা দার্শনিক বলি— এদের সবাই জ্ঞানের ব্যাপারে কথা বলেছেন সেই আদিকাল থেকেই। হয়তো গ্রীক যুগের আগ থেকেই এর চর্চা হয়ে আসছে। আসলে সঠিক সময়টা আমরা কেউ জানি না।

এই আলোচনায় আমরা বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছি। এই তিনটি প্রধান জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যকার এ সম্পর্কটি আসলে ক্রমসোপানমূলক বা hierarchiacal নয়। বরং, সমতলধর্মী বা horizontal।

বিজ্ঞান অথবা দর্শন, কিংবা

বিজ্ঞান অথবা ধর্ম, কিংবা

দর্শন অথবা ধর্ম— বিষয়টি এ রকম নয়।

বিজ্ঞান আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন। বিজ্ঞান দিয়ে শুরু করলেও সত্যানুসন্ধান প্রক্রিয়ার অগ্রগতিতে আমরা এক পর্যায়ে জীবন ও জগতের বৃহত্তর সত্যকে জানার জন্য পরবর্তী লেভেল তথা ‘why’ প্রশ্নের মুখোমুখি হই বা হতে বাধ্য হই।

এ পর্যায়ে দর্শন আমাদেরকে যুক্তির হাতিয়ার তুলে দেয়। যার সাহায্যে আমরা কিছু প্রকল্প বা বিকল্পকে নির্ধারণ করি। অবশেষে এর মধ্য হতে কোনো একটা বিকল্পকে আমরা একমাত্র সত্য হিসেবে গ্রহণ করি।

আমাদের দর্শনচর্চা অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি আমরা কোনো একটি বিশেষ দার্শনিক অবস্থানে নিজেদের আইডেন্টিফাই না করি। আগেই বলেছি, ক্লাইমেক্স অব ট্রাজেডি হলো, আমরা যখন অপরাপর বিকল্পগুলোকে বাতিল বা অগ্রাহ্য করে একটা সুনির্দিষ্ট দার্শনিক অবস্থান গ্রহণ করি তখন আমরা প্রকারান্তরে দর্শনের যে নিরপেক্ষ ও মুক্ত আবহ তথা ফ্রিনেস, সেটাকেই অগ্রাহ্য করি।

বিশেষ দার্শনিক অবস্থানকে ‘দ্যা অনলি ট্রুথ’ হিসেবে গ্রহণ করাটা হলো আসলে বিশেষ কোনো বিশ্বাস-ব্যবস্থার উপর আস্থাশীল হওয়ার নামান্তর। এই দৃষ্টিতে দর্শন শেষ পর্যন্ত একজন দার্শনিকের কাছে এক ধরনের ধর্মে পরিণত হয়, বিশ্বাসব্যবস্থাকে যদি আমরা ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে মনে করি। যদিও এই ধর্মের বিশেষ কোনো রিচুয়াল থাকে না। এর পরিবর্তে (বিশ্বাসের পাশাপাশি) থাকে ধর্মের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য এক ধরনের আধ্যাত্মিকতা বা sense of transcendence।

১৭ জুলাই, ২০১৯

<https://freethoughts.dorshon.com/science-philosophy-and-religion>

ফিলোসফিক্যাল প্রবলেমকে ডিল করতে গিয়ে সায়েন্টিফিক প্রফ চাওয়ার সমস্যা

“কেউ যদি বলে, ‘আত্মপরিচয় জানার আকাঙ্ক্ষা থাকা মানুষ হওয়ার জন্য জরুরি।’ বলা যায়, এটা তো দাবি। এর পেছনে কি সায়েন্টিফিক দলিল বা যুক্তি আছে? কারণ, আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা না করেও অনেকে সভ্য মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করছে। অনেক নাস্তিক দাবি করছে, বিশেষ কোনো আত্মপরিচয়ের প্রয়োজন নেই। সময় পেলে উত্তর দিবেন।”

আগের আলোচনার ধারাবাহিকতায় আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে পাঠক খান আফিফ ফারহানের সম্পূরক প্রশ্ন।

উত্তর:

আমি তো ফিলোসফির লোক। আর্টস ফ্যাকাল্টির একটা সাবজেক্ট ফিলোসফি। আমার কাছে সায়েন্টিফিক দলিল চাওয়া কেন?

যদুুর বুঝেছি, লোকেরা মনে করে সায়েন্স সার্টিফায়েড কোনো কিছু হলো সত্য ও নির্ভরযোগ্য। অথচ, সায়েন্স স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে ফিলোসফির ওপরে। সায়েন্স যেখান থেকে শুরু করে সেটা সায়েন্স নয়, লজিক তথা ফিলোসফি। সায়েন্স কাজ করে ইনডাক্টিভ লজিক বা আরোহমূলক যুক্তি পদ্ধতিতে। সায়েন্স বিশ্বাস করে অভিজ্ঞতাবাদ বা এম্পিরিসিজমে। অথচ, জ্ঞানের উৎপত্তিমূলক মতবাদসমূহের মাত্র একটি হলো অভিজ্ঞতাবাদ। সায়েন্স বিশ্বাস করে বা সত্য বলে ধরে নেয় বাস্তববাদ বা রিয়েলিজমকে। অথচ, সত্তা সম্পর্কিত অনেকগুলো মতবাদ বা তত্ত্বের মধ্যে এটি একটিমাত্র বা অন্যতম। একমাত্র নয়।

সায়েন্স সত্য বলে ফর গ্রান্টেড ধরে নেয় প্রকৃতিবাদ বা ন্যাচারালিজমকে। যেটাকে আমরা বলি সায়েন্টিফিক ন্যাচারালিজম। এর বিকল্প তত্ত্ব হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম। আচরণবাদ বা বিহেভিয়ারিজমকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে সায়েন্স

ডিসিপ্লিনে রিসার্চ করা হয়। অথচ, মনোদর্শনে আচরণবাদ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মত, ধারণা বা প্রস্তাবনাসমূহের একটিমাত্র বা অন্যতম একটি প্রস্তাবনা বা থিওরি।

সায়েন্স বা যে কোনো সাবজেক্ট যেখানে থেমে যায়, অন্য ডিসিপ্লিনের লোকদের গবেষণার দৌড় যেখানে সমাপ্ত হয়, ওই সাবজেক্ট সম্পর্কিত ফিলোসফিক্যাল স্টাডি সেখান হতে শুরু হয়।

আফসোস!!! লোকেরা ফিলোসফারের কাছে সায়েন্টিফিক দলীল খোঁজে। বলা যায়, এটি জমানার দুর্ভাগ্য!!! সায়েন্সিজমের যুগে সায়েন্টিজমই হলো বিজ্ঞানবাদী লোকদের কাছে একমাত্র একসেপ্ট্যাবল 'স্ট্যান্ডার্ড'!!!

যারা কোরআন স্টাডি বা উলুমুল কোরআনকে 'কোরআনিক সায়েন্স' বানিয়ে নিয়েছেন তাদের কাছ হতে আর কীইবা আশা করা যায়!!!

প্রশ্নকর্তাকে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনে করি। অপ্রিয় সত্য কথা বলার সুন্নত আদায় করতে গিয়ে এ কথাগুলো বললাম।

আত্মপরিচয় অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় মানুষ ক্রমান্বয়ে সভ্যতা গড়ে তুলেছে

এবার আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে বলা যাক।

মানুষ প্রাকৃতিক জীবন ছেড়ে, প্রকৃতিকে মেনুপুলেইট করে, নিজের সুবিধা মোতাবেক কাজে লাগিয়ে সভ্য হয়েছে। নচেৎ মানুষ অপরাপর প্রাণীদের মতো গুহায় বসবাস করতো। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো। বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম আবিষ্কার করতো না। সভ্যতা গড়ে তুলতো না।

এবার বলুন, কিংবা একটুখানি ভাবুন, মানুষ কেন সবকিছু জানতে চায়? অপরাপর প্রাণীর মতো সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তিনির্ভর জীবন যাপন না করে মানুষ কেন স্বীয় সহজাত প্রবৃত্তি বহির্ভূত ফিলোসফিক্যাল অন্ড রিলিজিয়াস বিষয়ে ভাবিত হয়? এনগেইজ হয়? শুধুমাত্র মানুষের অভাবনীয় ভাষাগত উন্নতির কারণ কী? অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রসঙ্গ আসে না কেন? মানুষ কেন স্বীয় ন্যাচারাল হেবিটেট বা প্রাকৃতিক আবাসস্থল ছেড়ে পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে? কেন সে মহাশূন্য জয় করতে চায়? মানুষের এই অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তার হেতু ও উদ্দেশ্য কী?

আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা শুধু নয়, আত্মপরিচয়ের প্রশ্নকে সমাধান না করে কেউ তো সভ্য হতে পারে না। যে স্ট্যান্ডার্ডেই হোক না কেন, সভ্যতা মানেই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট

আত্মপরিচয়। আত্মপরিচয়ের ঠেলুনি ও জীবনবোধের গুতানি না থাকলে মানুষ মানুষ হয়ে উঠতো না।

হ্যাঁ, হতে পারে, এই আত্মপরিচয়কে মানুষ অবচেতনে সঠিকভাবে বুঝে নিলেও এক শ্রেণীর মানুষ সচেতনভাবে সেটাকে স্বীকার করে না, বা করতে চায় না। খেয়াল করলে দেখবেন, নাস্তিক-অণ্ডেয়বাদীদেরও নিজস্ব জীবনবোধ ও জীবনদর্শন আছে। নিজেদের মতো করে তাদেরও আছে নৈতিকতা ও মানবিকতা।

আত্মপরিচয় ছাড়া নৈতিকতা ও মানবিকতা হয় কী করে?

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

<https://freethoughts.dorshon.com/problems-of-scientific-proof-to-deal-with-philosophical-problems>

Philosophy deals with the 'what' question in 'why' format.

পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ ও যুক্তির পার্থক্য

মানুষের সাথে অন্য প্রাণীর অনেক মিল আছে। কিন্তু আমি ফোকাস করছি অমিলগুলোর প্রতি। সেগুলো কেন?

পাঠকের পাল্টা প্রশ্ন: কেন সে সিরিয়াস হবে? কেন সে এই প্রশ্নকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে? অথচ এ প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়াই ভালোভাবে থাকা যায়, অনেকে এমনটা দাবি করছে। তাদের ধারণায় তারা সুখেই আছে।

আমার পাল্টা প্রশ্ন: মানুষ কেন মানুষ হয়েছে? এক কথায় জবাব দিবেন।

পাঠকের পক্ষ থেকে উত্তর: অনেকে অনেকভাবে জবাব দেয়। তাদের মস্তিষ্ক অন্য প্রাণী থেকে শক্তিশালী, প্রত্যেকটা দিক থেকেই অ্যাডভান্স। এটা দিয়েই এখন জবাব দেওয়া হচ্ছে।

এখানে কেউ শুধু অস্তিত্বের কারণ খোঁজাকে দায়ী করেছে কিনা আমার জানা নাই। জানা থাকলে আপনি বলুন।

আমার উত্তর: আপনি রেফারেন্স চাচ্ছেন। সরি! আমি রেফারেন্স দিয়ে কথা বলি না। আমার লেখা ও কথায় রেফারেন্স থাকে না। অথবা, খুব কম রেফারেন্স থাকে। এমন রেফারেন্স যা সবাই জানে। আমি যুক্তি দিয়ে কথা বলি।

পাঠকের প্রশ্ন: যুক্তিটা কী, সেটাই তো জানতে চাচ্ছি। যুক্তি প্রয়োগে দলীলের কি প্রয়োজন নেই? কেউ কিছু দাবি করলে তার দলীল আবশ্যিক। যদি দলীলের প্রয়োজন না হয় সেটারও দলীল আবশ্যিক। দলীল হতে পারে যুক্তি, সায়েন্স ইত্যাদি। যেটা আমাদের মস্তিষ্ক উপযুক্ত মেনে নিবে। এটা আমি মনে করি।

এ পর্যায়ে আমি বলেছি: যুক্তি কী? এই প্রশ্নের সোজাসাপ্টা জবাব হচ্ছে, যুক্তি হলো যুক্তি।

যদি বলি যুক্তি হলো ‘ক’। তাহলে প্রশ্ন উঠবে ‘ক’ কী? তখন যদি বলা হয় ‘ক’ হলো ‘খ’, তাহলে প্রশ্ন উঠবে ‘খ’ কী? ‘খ’ কেন সঠিক হবে? এভাবে আপনি এক অন্তহীন পরম্পরায় পৌঁছবেন।

উক্ত পাঠক এ পর্যায়ে প্রশ্ন করেছেন: *এখানে আপনার যুক্তিটা কী? যুক্তিতে তো দাবি করা হয়। দাবিকে তো প্রমাণ করতে হবে, মানুষের কাছে উপযুক্ত হতে হলে। তাই নয় কি?*

আমার উত্তর: যুক্তি প্রমাণ করা যায় না। যুক্তি প্রমাণ করার বিষয় না। যুক্তি আর প্রমাণ, দুইটা দুই ক্যাটাগরি। দুইটা গুলোয়ে ফেলা হলো ক্যাটাগরি মিসটেক। যুক্তিকে উপস্থাপন করা হয়। মানা না মানা যার যার বিষয়।

ফিলোসফি হলো যুক্তির ব্যাপার-সাপার। ফিলোসফিতে প্রমাণ থাকে না। ফিলোসফি বরং প্রমাণের প্রামাণিকতা নিয়ে কাজ করে। কথিত প্রমাণের ভিত্তি হলো যুক্তি। আপনি ফিলোসফির বইপত্র পড়ে দেখতে পারেন। আপনার পছন্দ মতো। সায়েন্স, ফিলোসফি আর রিলিজিয়ন— এই তিনটা তিন ডোমেইন। ভিন্ন ভিন্ন ডিসিপ্লিন। একটার চোখ দিয়ে অন্যটাকে দেখা ভুল।

এই তিন বেসিক ডোমেইনের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আমার কিছু লেখালেখি ও পোস্টার আছে। freethoughts.dorshon.com এবং cscsbd.com-এ এগুলো পাবেন। ভালো থাকেন।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Titas Rahin Tanvir: যুক্তির যদি প্রমাণ কিংবা মানদণ্ড না থাকে, তবে সেই যুক্তি যে আসল যুক্তি— সেটা মেনে নেবার যুক্তিটাই বা কী?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যুক্তি মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলে সেটি যুক্তি না হয়ে প্রমাণ হয়ে যায়। যুক্তি মাত্রেরই মেনে নেয়ার কারণ বা যুক্তি থাকে; মেনে না নেয়ারও কারণ বা যুক্তি থাকে। ব্যক্তির অন্তর্গত ঝোঁকপ্রবণতা বা বিশ্বদৃষ্টি কিংবা তার আবেগই ঠিক করে, কোন ধরনের যুক্তিকে সে গ্রহণ করবে।

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

<https://freethoughts.dorshon.com/observation-evidence-and-reasoning>

সায়েন্সের লোকেরা ফিলোসফিকে স্বীকৃতি দিতে চায় না কেন?

ফিলোসফির লোকেরা সায়েন্স মানে। কিন্তু সায়েন্সের লোকেরা সাধারণত ফিলোসফিকে স্বীকৃতি দিতে চায় না।

কেন এমনটা হয়? জানতে চান?

তাহলে, একজন পাঠকের সাথে আমার এই প্রশ্নোত্তরটি পড়তে পারেন।

“স্যার, বহুমাত্রিক বা ভিন্নমাত্রিক জগত নিয়ে ফিলোসফির দৃষ্টিকোণ কেমন হতে পারে? যেমন, কোনো আন্তিক যখন বলে, আত্মা, জ্বিন, ফেরেশতা ভিন্নমাত্রিক জগতের বস্তু বা প্রাণী। বেহেশত বা দোযখ হলো ভিন্নমাত্রিক জগতের গ্রহ। এক্ষেত্রে জগত বললেই সেখানে সময়ের প্রয়োজনীয়তা কি আসে? নাকি, সময়হীন জগত সম্ভব?

আল্লাহ কি নিছকই সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা? নাকি, তার নিজেরও কোনো জগত আছে?

আমি যতদূর জানি, ফিলোসফি ইজ দ্যা মাদার অফ সায়েন্স। কোয়ান্টাম ফিজিক্স মাল্টি-ডাইমেনশন স্বীকার করে। এবং সেটা করে ফিলোসফিক্যাল ভিউ-পয়েন্ট বা হাইপোথিসিস দিয়ে। ... তাহলে, কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে কি ফিলোসফি বলা যায়?”

হ্যাঁ, জগতে multi-dimension আছে, এটি বিজ্ঞান স্বীকার করে। বিজ্ঞানীরা স্ট্রিং থিওরির সমর্থনে ১১ মাত্রাসম্পন্ন ভৌত জগতের কথা বললেও বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা বুঝতে পারি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে খুব সম্ভবত এই মাত্রার সংখ্যা আরও বাড়বে। এবং যত মাত্রার

কথাই আমরা বলি না কেন, এই ডাইমেনশন বা মাত্রাগুলোর প্রকৃত অবস্থা, হতে পারে, আমরা যেভাবে ভাবি তা থেকে ভিন্নতর।

পার্টিকুলার এন্টিটি হিসেবে জগতের সামগ্রিক বাস্তবতা তথা অ্যাবসলিউট রিয়েলিটিকে আমরা কখনোই পুরোপুরি জানতে পারি না, পারবো না, পারার কথাও নয়। আমাদের যুক্তি আমাদেরকে এটা বলে। তারপরও আমরা জানতে চাই। এবং বাস্তবিকই অনেক কিছু জেনেছি ও জানতে পারি। ভবিষ্যতে এই জানার পরিধি আরও বাড়বে। কিন্তু কখনো সেটা ‘প্রকৃত বাস্তবতা’কে ছুঁতে পারবে না বা অতিক্রম করে যেতে পারবে না। পার্টিকুলার-অ্যাবসলিউট রিলেশনের অটোলেজি দিয়ে আমরা এটি বুঝতে পারি।

অতীতের জ্ঞানের নিরিখে আমাদের বর্তমান জ্ঞান সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিত। Yet, any knowledge of science is always falsifiable. হাতে থাকা বা আওতার মধ্যে থাকা তথ্য, প্রমাণ, যুক্তি ও সাক্ষ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে আমরা কোনো কিছুকে সঠিক ও নিশ্চিত হিসেবে গ্রহণ করি। কিন্তু আমরা নিজেরাই জানি, যে কোনো ‘মানবিক নিশ্চয়তা’ হলো ‘আপাত নিশ্চয়তা’ বা ‘আমাদের জন্য নিশ্চয়তা’।

মানুষ যদি নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু জানতে চায়, তাহলে তাকে বিজ্ঞান পেরিয়ে দর্শনের সাহায্য নিতে হবে। কথাটা খেয়াল রাখতে হবে, আমি বলেছি ‘বিজ্ঞান পেরিয়ে’; তার মানে হলো, আমাদের কোনো জ্ঞানই বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে বা অগ্রাহ্য করে সম্ভব হতে পারে না। একই সাথে, শুধুমাত্র বিজ্ঞান দিয়েও আমাদের চলবে না।

বিজ্ঞান শুরু হয় দর্শন দিয়ে। আবার বিজ্ঞান যেখানে গিয়ে শেষ হয়, এর পরের অংশটুকু পিউর এন্ড এক্সক্লুসিভলি এরিয়া অফ ফিলোসফি। বিজ্ঞানের সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে কিছু দার্শনিক অনুমানের উপর ভর করে। Principle of uniformity of nature বা PUN হলো এর অন্যতম।

দর্শনের বহুমাত্রিকতা ও বিকল্পগুলোর মধ্য থেকে কেউ যখন কোনো একটাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে গ্রহণ করে নেয়, তখন কার্যত তিনি দর্শনের ওপেননেস এবং ইনক্লুসিভনেসকে পরিত্যাগ করে এক ধরনের বিশ্বাসব্যবস্থার সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে আমরা এ জগতে বাস্তবে নিরপেক্ষ থাকতে পারি না। এমনকি, নিরপেক্ষতাও এখানে একটা পক্ষ হিসেবে হাজির হয়। এভাবে ব্যক্তি-মানুষের কাছে দর্শন এক পর্যায়ে ধর্ম হয়ে উঠে। প্রচলিত কোনো ধর্মের সাথে এই ‘ব্যক্তিগত ধর্ম’-এর মিল হতেও পারে, নাও হতে পারে।

সে যাই হোক। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে খানিকটা বলি।

কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মধ্যে ফিজিক্স কম, ফিলোসফি বেশি। সেটার নেচার অনুসারে এটি অবশ্যম্ভাবী।

একটা মজার গল্প প্রচলিত আছে। অস্ট্রেলিয়াতে একজন গণিতবিদ, একজন পরিসংখ্যানবিদ এবং একজন কসমোলজিস্ট ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। ট্রেন থেকে তারা একটা ডোরাকাটা অস্ট্রেলিয়ান গরু দেখে পরস্পরের মধ্যে এ বিষয়ে বলাবলি করছেন।

মহাকাশ নিয়ে যিনি গবেষণা করেন তিনি বললেন, “দেখো অস্ট্রেলিয়ার গরুগুলো এ রকম ডোরাকাটা।” পরিসংখ্যানবিদ বলল, “না। তোমার কথা ভুল। বরং অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ গরু এ রকম ডোরাকাটা।” আর গণিতবিদ বললো, “তোমাদের দুজনের কথাই ভুল। তোমরা বরং বলো, অস্ট্রেলিয়ার কমপক্ষে একটা গরু এ রকম ডোরাকাটা।”

এই গল্পটা থেকে আমরা বুঝতে পারি, একেক ধরনের ডোমেইন ও ডিসিপ্লিনে একই বিষয় সম্পর্কে আলাপ আলোচনার পদ্ধতি একেক রকমের। একই তথ্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন ডিসিপ্লিন ভিন্ন ভিন্ন রকমের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের কারণে যেমন একই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হয়, তেমনি করে ভিন্ন ভিন্ন ডিসিপ্লিনের স্পেসিফিক মেথডলজির কারণে একই বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

নানা ধরনের knowledge faculty বা ডিসিপ্লিনের পারস্পরিক সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও পূর্বাপর সম্পর্ক নিয়ে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নাই। যদিও তারা স্ব স্ব ফিল্ডে যথেষ্ট জ্ঞানী-গুণী, গবেষক ও বিদ্যাজ্ঞ। অন্যান্য ডিসিপ্লিনের সাথে নিজের ফিল্ড অব ইন্টারেস্ট ও ডিসিপ্লিনের পারস্পরিক মিল-অমিল সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে ইন্টারডিসিপ্লিনারি আভারস্ট্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়। হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেজন্য কোনো একটা বিষয়ে বিশেষ করে জানার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে একটা সামগ্রিক কিন্তু স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করা জরুরি।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

আক্বাস আলী: Dear Sir, why do you think a particular being will never know an absolute reality of something?

Mohammad Mozammel Hoque: by definition, part can't fully grasp or conceive the whole. moreover, when the 'whole' is unlimited or infinite. this is logical and ontological necessity.

আকাশ আলী: I know that God is whole, but what about everything else? Isn't it a logical fallacy to say that since we cannot know about the absolute being (God), I cannot know the absolute reality of everything else?

Mohammad Mozammel Hoque: God is a relevant issue here, in this discussion. not the central issue. Once again, the main thing and the most important issue is the ontology of absolute-particular relation. From particular's point of view, there has to be some ENTITY which is Absolute. otherwise, the particular cannot be particular at the very first place.

particulars know the Absolute by their own existences and by the mood of their relation with the Absolute, i.e. how the absolute appears to the particulars. for the particulars, Absolute's existence is knowable, but not the True Reality of the Absolute.

to know something's existence and to know the specific inner attributes or ontology of that existence, these two are different aspects.

we know the ocean is big. but we don't know for sure what the things are there in the ocean(s) and how big it is. Moreover, the case of us and the oceans belongs to close ended category. Whereas the case of Absolute and the particulars relation is a matter of open-ended category or relation.

That's why, the Absolute's existence is knowable, but only by Its appearing or revealing characteristics, which are suitable or understandable by the particulars.

আকাশ আলী: Sir, thank you for the response. To better understand the topic, I would like to elaborate my thoughts here.

From your response I have understood that the absolute-particular relation is more focused (if not only applicable) on God vs creation, not creation vs creation. In other words, I can know the True Reality (প্রকৃত বাস্তবতা) of anything inside or outside of this universe, but true reality of God cannot be known. Right? Or, true reality of 'Anything' cannot be known according to Philosophy?

Actually, I was thinking that although we humans have limitations as a particular being, but we can use Collective Intelligence, Artificial intelligence (AI) and Quantum Computers to not only overcome our limitations, but also understand the "true reality" of many (if not all) natural and universal phenomenon.

For instance, if we want to know the true reality of "Gravity" or "Consciousness", we will be able to do that in near future by using our advance technologies. It basically means we are not bound by our limitations.

However, our limitations ONLY apply on knowing the Absolute being, The God. We can only know him by his appearing and ontological characteristics, not by the true reality. Right?

Mohammad Mozammel Hoque: I would rather suggest you to explore (1) the hard problem of consciousness, by David Chalmers, and (2) concept of reality in philosophy, specifically the ontology of reality, and (3) the

incompleteness theorem by Kurt Gödel, (4) and identity of the self in philosophy of mind, finally, (5) the qualification problem. never mind please!

আকাশ আলী: Ok will go through those books and theories.

Mohammad Mozammel Hoque: Oh, sorry! these are not books, but theories and issues.

These matters show that the fundamental concepts or understandings are not clear to us, though we have to use some concepts as fundamental in our applied fields.

we don't know the intrinsic characteristics of consciousness. consciousness is quite mysterious. we deal with reality, yet the question of reality is not settled by philosophy. it's actually undefined and not solve-able. we do math with formula and axioms. but mathematical axioms are incomplete within the concerned axiomatic system. our person-hood or identity is unidentified to us. we are yet to resolve the conflict and gap between quality with quantity. we claim to get precision through quantification. though we know that quality can't be quantified.

Our limitations are obvious. we sometimes easily 'solve' the problem without understanding first the very criteria or scale by which we are doing our judgment and measurement.

Mohammad Mozammel Hoque: I am not an AI enthusiast. I have my theory on that. If you are interested and have time, you can check these videos:

1. AI, Singularity & Constant Gap (CGT) Theory:



www.youtube.com/watch?v=escNZ9XvbOo

2. Constant Gap Theory (CGT) বিষয়ে সেমিনারে
উপস্থাপিত বক্তব্য:

www.youtube.com/watch?v=6HqtIEoxb3s



3. Constant Gap Theory (CGT) বিষয়ে সেমিনার
পরবর্তী প্রশ্নোত্তর:

www.youtube.com/watch?v=veK1PjScsEI



আকাশ আলী: Google claims 'quantum supremacy' for computer
(<https://www.bbc.com/news/science-environment-50154993>)

স্যার, Quantum Supremacy অর্জিত হলে পূর্ণ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) অর্জন কঠিন কোনো কাজ হবে না।

Mohammad Mozammel Hoque: কেউ যদি সাবজেক্টিভিটিকে নিছক ফিজিক্যাল ফেনোমেনা বলে মনে করেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিই যদি এ বিষয়ে একমাত্র সঠিক উত্তর হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কখনো না কখনো অবশ্যই সম্ভবপর হয়ে উঠবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্গত ধারণা বা underlying assumption হলো, ন্যাচারাল বা রিয়েল বলে সত্যিকারের কোনো ভাগাভাগি নাই। অর্থাৎ, রিয়েল বলে রিয়েল কিছু নাই। তারমানে হলো, সবকিছুই আদতে আর্টিফিশিয়াল। যদিও আমরা কিছু কিছু আর্টিফিশিয়াল এন্টিটিকে ভুল করে রিয়েলি রিয়েল বলে মনে করি। এই ধারণাটি কন্ট্রাডিক্টরি এবং self-refuting।

অপরদিকে, যে ব্যক্তি ফিজিক্যালিজমকে কিংবা এর ভেরিয়েশনগুলোর কোনোটিকেই সঠিক বলে মনে করেন না এবং যিনি কোনো না কোনো ধরনের সত্তাগত দ্বৈতবাদ বা ontological dualism-এ বিশ্বাসী, স্বভাবতই তিনি মনে করবেন, সাবজেক্টিভিটির সাথে ফিজিক্যালিটির সম্পর্ক অভিন্ন নয়, বরং আবশ্যিক (necessary, but not identical)।

এমন ব্যক্তির কাছে David Chalmers-এর চেতনার হার্ড প্রবলেমের (<https://dorshon.com/hard-problem-of-consciousness>)

মতো, মানুষের সাবজেক্টিভিটিও একটি বাস্তব অথচ ফিজিক্যালিটির উর্ধ্বতন বিশেষ 'একটা কিছু' যা কার্যকর কিন্তু ব্যাখ্যাভীত। এমন ধরনের ontologically non-monist ব্যক্তির মতে, আর্টিফিশিয়াল এবং রিয়েল,

এই দুইটা বিষয় বাই ক্যাটাগরি আলাদা হওয়ার কারণে তাত্ত্বিক বা ontological দিক থেকে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি, আর্টিফিশিয়াল কোনো এন্টিটি কখনো রিয়েল হয়ে উঠবে না; কিংবা উঠতে পারবে না।

এহেন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের মতে, কম্পিউটারের অকল্পনীয় ডেভলপমেন্ট হবে বটে। তবে তা হবে শুধুমাত্র ফাংশনাল বা এফিশিয়েন্সি রিলেটেড আসপেক্টে। সাবজেক্টিভিটি বা ক্রিয়েটিভিটির দিকগুলোতে কোনো আর্টিফিশিয়াল এন্টিটি আসতে পারবে না।

এই পর্যায়ে এসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সৃজনশীলতা বা intrinsic creativity থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সৃজনশীলতার অনুকরণ (mimic) বা সাদৃশ্যমূলক রিপ্রেজেন্টেশনকে অবশ্যই আলাদা করে দেখতে হবে। ক্রিয়েশন এবং সিমিউলেশনের পার্থক্য স্মরণে রাখতে হবে।

এসব বিষয় নিয়ে philosophy of artificial intelligence (<https://dorshon.com/synopsis/philosophy-of-ai>) শিরোনামে যে কোর্সটি আমি অনার্স ফোর্থ ইয়ারে পড়াই, সেখানে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

<https://freethoughts.dorshon.com/science-philosophy-and-religion-in-a-nutshell>

দর্শন কী? প্রসঙ্গ: দর্শন ও ইসলাম

‘মানুষ’ মানুষ হয়েছে দর্শন চর্চার মাধ্যমে। মানুষ জানতে চেয়েছে, অতিক্রম করে যেতে চেয়েছে। তাতে সে অর্জন করেছে প্রযুক্তি, গড়ে তুলেছে বিজ্ঞান। হয়েছে সভ্য। চোখ দিয়ে আমরা দেখি। কিন্তু চোখকে দেখি না, যদি না আয়নার সামনে দাঁড়াই। তেমনি দর্শনে ডুবে থেকে মানুষ দর্শন সম্বন্ধে বেখবর হয়ে থাকে। বলে- ফিলোসফি ইজ ডেড। দর্শনের দরকার নাই। দর্শনের বিরোধিতা করার ব্যাপারে আন্তিক, ধর্মবাদী, সংশয়বাদী ও নাস্তিক- সব ক্যাটাগরির লোকদের একাংশের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যমত্য লক্ষ্য করা যায়। স্টিফেন হকিংয়ের সাড়া জাগানো সর্বশেষ বইটির একটা চ্যাপ্টার হলো দর্শনের কথিত মৃত্যুর দাবি নিয়ে। এমনকি ‘সোনার বাংলাদেশ ব্লগের’ একজন অতি সম্মানিত বিদ্যাজ্ঞ ও সম্প্রতি ইসলামের দিক থেকে দর্শনের বিরোধিতা করে পোস্ট দিয়েছেন।

মানুষ যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন সে যথাসম্ভব চেষ্টা করে তার নিকট স্বীকৃত মানদণ্ড দিয়ে যাচাই করে সর্বোত্তমকে গ্রহণ করতে। এমনকি মানুষ যখন লটারি করে তখনও সে র‍্যাশনাল ডিসিশন গ্রহণ করে। যেমন- সফরে কোন স্ত্রীকে সাথে নিবেন তা ঠিক করতে রাসূল (সা) লটারি করতেন। যেভাবে আম্পায়ার বা রেফারিগণ লটারি করে থাকেন। মোদ্দা কথা হচ্ছে, যখনই আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নিবেন, যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন, সেটি অতি অবশ্য আপনার র‍্যাশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে নিবেন। বলাবাহুল্য, এটিই হচ্ছে দার্শনিক পদ্ধতি। প্রতিটি মানুষই হচ্ছে এক একজন দার্শনিক।

মানুষ প্রতিনিয়ত পদার্থবিদ্যার নিয়ম মেনে চলাফেরা করে, যদিও সে জানে না কেন সে বাঁক নেবার সময় একটা নির্দিষ্ট মাপে হেলে চলে। একজন পদার্থবিদ্যাবিদও তাই করেন। অবশ্য তিনি নিয়মটি জানেন বা জানার চেষ্টা করেন। সেজন্য তিনি পদার্থবিদ্যাবিদ। আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত শরীরবৃত্তি প্রক্রিয়াদি চলছে। এজন্য আমরা বেঁচে আছি বটে। কিন্তু আমরা জানি না এসব ফিজিওলজিক্যাল প্রসিডিউর কী বা কীভাবে হচ্ছে। একজন শরীরতত্ত্ববিদ সেটি জানেন। আর যা জানেন না, তা জানার চেষ্টা করেন। একজন কৃষক কৃষিবিদ্যার নিয়ম মেনেই চাষাবাদ করেন। কিন্তু

তিনি জানেন না কৃষিবিদ্যা বিভাগে এসব বিষয় নিয়ে কী ধরনের জ্ঞানচর্চা হয়ে থাকে। তেমনি, যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন চর্চা করেন তারা জানে ও জানার চেষ্টায় থাকেন সব বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান। সংশ্লিষ্ট জ্ঞানগত শাখাটি যেসব বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বা ধ্রুবক হিসেবে (নির্বিচারে) গ্রহণ করে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়, দর্শনের কাজ হচ্ছে সেই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা। তাই, ফিলোসফি ইজ অলওয়েজ ফিলোসফি অফ সামথিং।

মানুষ মঙ্গল গ্রহে নভোযান পাঠিয়েছে। আপনারা, ফিলোসফির লোকেরা কী করেছেন? একজন নবীন শিক্ষার্থীর এমন এক প্রশ্নের জবাবে আমি পকেট থেকে কলম বের করে বললাম, দর্শনের লোকেরা এ রকম একটি কলমও তৈরি করতে পারে নাই। ন্যাশনাল জিডিপিতে তাদের কোনো অবদান নাই। তাহলে আমরা এটি কেন পড়বো? বা এটি কেন পড়ানো হবে? বিশ্বের নামকরা ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীকেরই ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট বলে কোনো বিভাগ নাই। এটি হলফ করে বলা যায়। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

তথাকথিত ভালো কোনো সাবজেক্টে চান্স না পেয়ে বাধ্য হয়ে দর্শন বিভাগে ভর্তি হওয়া এই স্টুডেন্টের সাথে একমত হয়ে আমি স্বীকার করলাম, নভোযান পাঠানো তো দূরের কথা একটা সুঁইও দর্শনের লোকেরা বানাতে পারে নাই। তাকে বললাম—আচ্ছা ইরাক, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে না হয় তেলের জন্য গেছে, মঙ্গল গ্রহে আমেরিকা পাথ ফাইন্ডার কেন পাঠালো? গুহা ও বন্য জীবন থেকে মানুষ কেন বের হয়ে আসলো? মানুষ কেন অজানাকে জানতে চায়? যা কিছু প্রচলিত, মানুষ কেন সেটিকে অতিক্রম করে নতুনকে পেতে চায়?

কারণ, সিন্দাবাদের সেই কাঁধে চড়ে বসা বুড়ো ভূতের মতো দর্শনচেতনা মানুষকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে বুঝে না—কেন সে ব্যবসায়ী না হয়ে বিজ্ঞানী হলো। বা, কেন সে বিজ্ঞানী না হয়ে সাহিত্যিক হলো। যখনই আপনি ‘কেন’ প্রশ্নটির মুখোমুখি হবেন, তখন এই ‘কেন’র উত্তর আপনি যা-ই ঠিক করেন না কেন, এমনকি কোনো উত্তরকেই সঠিক মনে না করলেও, আপনি দর্শনের জালে জড়িয়ে গেলেন। দর্শনই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জ্ঞান হলো দর্শনের পণ্য।

আমরা বিজ্ঞান চর্চা করবো প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সুখ, কল্যাণ বা ভালোকে পাওয়ার জন্য। ভালো কথা। কিন্তু সুখ বলতে আমরা কী বুঝবো? কার সুখ? কীসের সুখ? কীভাবে? কীসের বিনিময়ে? আসলে ‘আমরা’ কারা? সবাই তো ভালো চাই। কিন্তু ভালোটা কোথায়? আদৌ কোনো পরম ভালো আছে কি? থাকলে এর যুক্তি কী? এ ধরনের সব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিতে সব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিয়ে সে মোতাবেক জীবনযাপন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও এসব ব্যাপার নিতান্ত অবচেতনে ঘটে বা ক্রিয়াশীল

থাকে। ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলে তার অবস্থানটা জানা যায়। দর্শনের ইতিহাস যত দিনের, 'ফিলোসফি ইজ ডেড' দাবিটির ইতিহাসও প্রায় ততদিনের। ফিলোসফির বিরুদ্ধে যারা যুক্তি দেন, মজার ব্যাপার হলো তারা কোনো না কোনো দার্শনিক গোষ্ঠীর মতামত ও যুক্তিকেই তুলে ধরেন।

দর্শনের কোনো কনক্রিট ফাইন্ডিংস নাই। থাকতে পারে না। যে বিষয়ে কোনো বিরুদ্ধ মত পাওয়া যাবে না, তা দর্শন হতে পারে না। আর কোনো বিষয়ে বা কোনো কিছু সম্পর্কে মতৈক্য পাওয়া গেলে সেটি দর্শন হতে আলাদা হয়ে একটা স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন হিসেবে অগ্রসর হবে। যেভাবে একে একে সব সাবজেক্ট দর্শন হতে বের হয়ে গেছে। সর্বশেষ গেছে মনোবিদ্যা। এক সময় ফিজিক্সও ফিলোসফি হিসেবে ছিলো।

দর্শনের কোনো পক্ষ নাই, থাকতে পারে না। তবে দার্শনিকের অবশ্যই কোনো না কোনো পক্ষ থাকবে। যুক্তি-পাল্টায়ুক্তির মধ্যে ব্যক্তিমানুষকে কোনো একটা পক্ষে অবস্থান নিতে হয়। সতেচনভাবে না নিলে অবচেতন বা সামাজিকভাবে সে কোনো না কোনো পক্ষে নিজেকে আইডেন্টিফাই করে। দর্শন-শিক্ষকের কাজ হলো বিপরীত বা বিকল্প মত ও তৎসংশ্লিষ্ট যুক্তিসমূহ তুলে ধরা।

তাহলে আমরা প্রথম কথায় আবার ফেরত আসলাম, অর্থাৎ যখনই আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেই তখন আমরা দার্শনিক পদ্ধতি মেনেই তা নেই। সেটি যা-ই হোক না কেন। ঈশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী বা সংশয়বাদী যা-ই হোন না কেন, আপনি একটি দার্শনিক মতেরই অনুসরণ করছেন। জাতীয়তাবাদী, বা আন্তর্জাতিকতাবাদী- যাই হোন না কেন, আপনি একটি প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদকেই সঠিক হিসেবে গ্রহণ করছেন। মানুষকে বলা হয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। বুদ্ধিচর্চা তো দার্শনিকতারই নামান্তর।

তাহলে, ইসলামের সাথে দর্শনের কী সম্পর্ক? আমার দৃষ্টিতে, ইসলাম হচ্ছে দর্শনের সারনির্যাস। মজার ব্যাপার হলো দর্শনের খুব কম সংখ্যক লোকেরা এটি জানে। এবং ইসলামপন্থীরা কোমর বেঁধে এ কথার বিরোধিতা করছে ও করবে! আচ্ছা, মুয়াজ ইবনে জাবালকে রাসূল (সা) যখন বললেন, 'রা-সুল আমরি আল-ইসলাম' (মূল বিষয় হলো ইসলাম)- এ কথা দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছিলেন? ইসলামের, বিশেষ করে ঈমানের পদ্ধতি কী? দর্শন চর্চা ইসলামে কতটুকু প্রাসঙ্গিক?

এসব প্রশ্নের জবাব পাবেন পরবর্তী নিবন্ধে।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

নোমান সাইফুদ্দাহ: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এই বিষয়টি ভাবছিলাম। এবং আপনার এক ছাত্রের সাথে অনেক কথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে আপনার কথা বলেছেন। কিন্তু মাঝে অনেক দিন আপনি ব্লগে আসেননি। তাই কথা বলতে পারছিলাম না। ভালো হয়েছে। আমরা ইসলামের নামে অনেক কিছুই ইসলামবিরোধী বিষয় উপস্থাপন করছি, যা কোনোভাবেই উচিত নয়। যে যেই বিষয়ে জানে না, সে বিষয়ে লেখা মানেই বোকামী করা। আপনাকে আবারও মোবারকবাদ। আশা করছি নিয়মিত ব্লগে লিখবেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

ইসলামপন্থী লোকজন যে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার দিক থেকে অনেক সংকীর্ণ ও অনাগ্রহী, মন্তব্যের অত্যন্ত সেটি প্রমাণ করে। দর্শন, বিশেষ করে নাস্তিকতা নিয়ে যখন আমি সামহোয়্যারে লিখতাম, তখন অনেক মন্তব্য আসতো।

এসবি ব্লগ একটা স্টেরিওটাইপে আবদ্ধ হয়ে আছে। অন্তত পাঠক ও লেখকের দিক থেকে।

“আমরা ইসলামের নামে অনেক কিছুই ইসলামবিরোধী বিষয় উপস্থাপন করছি, যা কোনোভাবেই উচিত নয়।”- আপনার এই মন্তব্যের আলোকে আলোকপাত করুন। আলাদা পোস্ট দিলে, আমাকে দয়া করে বার্তা দিতে ভুলবেন না।

নীলু ও প্রজাপতি: “দর্শনে ডুবে থেকে মানুষ দর্শন সম্বন্ধে বেখবর হয়ে থাকে।”

এই বেখবরে বেখবর হয়ে থাকা মানুষের খাসলতের একটা অংশ হতে পারে। কিন্তু সে বেখবরকে জাস্টিফাইড করার জন্য যখন লোকে উঠে পড়ে লাগে তখন দ্বন্দ্ব পড়ে যাই।

দর্শন চর্চা বেদাত বা এটা পথভ্রষ্ট করে- এই ধরনের কথার মধ্যে দৈবতার আঁশটে গন্ধ লেগে থাকে। অথচ, আমরা দেখি সেই দৈবতাকে যুক্তিসম্মতভাবে (অনেক ধার্মিক যুক্তিসম্মত হতে না পারাকে লজ্জার কারণ মনে করেন) উপস্থাপনের কতই না চেষ্টা। কেন এই চেষ্টা?

কিন্তু সেইসব চেষ্টা কেন মানুষ করে? কেন তার এই অন্তর্নিহিত তড়পড়ানী সেই খোঁজ কি নিতে চায়? কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই বেখবরকে খবর করে তোলার

চেষ্টাকে (দর্শন নামে) গলা টিপে মারার চেষ্টা করা হয়। আজকাল দেখি সেটাকে বিজ্ঞান নামেও ডাকা হয়। অথচ শুধুমাত্র যদি এই প্রশ্ন তোলা হয়— আমরা যা যা নিয়ে কথা বলছি, কেন বলছি? তাহলে হয়তবা কিছু প্রশ্নের উত্তর মেলে।

কিন্তু যারা নানা দোহাইয়ে নিজেরা দরজা বন্ধ রাখে, অন্যদেরও বন্ধ করার কথা বলে, তারা কেন একবার নিজের দিকে ফিরে দেখে না।

সরি, দর্শন নিয়ে বিপত্তিকর অভিজ্ঞতার কিছু কথা বললাম। আপনার লেখার পরের অংশের অপেক্ষায় থাকলাম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: দর্শন নিয়ে ইসলামপন্থীদের মনোভাব আপনি যা বলেছেন মোটামুটি সেরকমই, দেখেছি। এসব ভুল ধারণা। তবে, প্রতিষ্ঠিত।

মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

২৯ জুলাই, ২০১১

<https://dorshon.com/what-is-philosophy-islam-and-philosophy>

As a second-order subject,
philosophy is always philosophy of something.

ইসলাম ও দর্শন: প্রচলিত ভুল ধারণার সংশোধন

রাসূল (সা) কীভাবে ওহী পেয়েছেন?

ইসলাম হলো দার্শনিকতার উৎকৃষ্টতম ফসল। দর্শনের মূলকথা হলো ইসলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সব ব্যাপারের মূল হলো আল-ইসলাম, নামাজ হলো এর ভিত্তি এবং জিহাদ হলো এর চূড়া। রাসূল (সা) যখন হেরা পর্বতের গুহায় ‘ধ্যান’ করতেন, তখন আসলে তিনি সেখানে কী করতেন? নিশ্চয়ই আমরা এখন যেভাবে বুঝি সেভাবে তিনি জিকির-মোরাকাবা করতেন না। সেখানে তিনি ঘুমাতেও যাননি। পালিয়েও থাকেননি। দারুন্ আরকামের মতো একটি নিরাপদ স্থান হিসেবেও সেটিকে বেছে নেননি।

বরং তিনি ভাবছিলেন, গভীরভাবে— একটা সত্যিকারের জীবনাদর্শ কী হতে পারে, সত্য কী, ন্যায়ের চূড়ান্ত মানদণ্ড কী হতে পারে, মানুষের মুক্তির পথ কী, এ জগতের রহস্য কী, এর কন্টিনিউশন কী হতে পারে ইত্যাদি ধরনের সমস্যা বা প্রশ্ন নিয়ে। এক পর্যায়ে তিনি ওহী লাভ করেন। যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আরাধ্য হেদায়েত বা দিকনির্দেশনা।

রাসূল (সা) সত্যকে জানা ও পাওয়ার জন্য প্রচলিত ধ্যানধারণাকে অন্ধভাবে গ্রহণ না করে স্থায়ী যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার চেষ্টা করে বুঝেছেন— যা কিছু প্রতিষ্ঠিত তার অনেক কিছুই ঠিক নয়। সমাধান কী হবে, তা তিনি গভীরভাবে ভাবছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবুয়তের আলো দিয়ে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূল হওয়ার কারণে তিনি ওহীপ্রাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন। সত্যকে পেতে চাইলে আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে ওহী পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না। ইতোমধ্যে ওহী এসে যাওয়ায় তার দরকারও নাই; তবে সত্যকে জানতে চাইলে যে কেউ তা খুঁজে পাবে। চূড়ান্ত ওহী-পরবর্তী এই সময়কালের সত্যপ্রাপ্তি হচ্ছে ওহীর সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়া, ওহীর সত্যতাকে খুঁজে পাওয়া।

কুরআন কীভাবে মানুষকে ডাকে?

কুরআন মানুষকে বলে চিন্তা-গবেষণা করতে। যেসব বিষয়কে পেরেনিয়্যাল প্রবলেম হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেসব সম্পর্কে জানতে, যাচাই করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের পাতায় পাতায় যুক্তি দিয়ে মানুষকে বলেছেন, যদিও পরমসত্তা হিসেবে তিনি শুধু করণীয় সম্পর্কে হুকুম নাযিল করলেও তা বাধ্যতামূলক হতো। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে দেখিয়েছেন নিদর্শন তথা আয়াত, যা যুক্তিবুদ্ধি তথা বিবেক-জ্ঞান দিয়ে খুঁজে নিতে হয়। জ্ঞানচর্চাকে, বুদ্ধির অনুশীলনকে প্রপাগেইট করা হয়েছে নিয়মিতভাবে। ঈমান বা বিশ্বাস হলো বুঝজ্ঞান অনুসারে পাওয়া একটা সিদ্ধান্ত বা উপসংহার। না বুঝে বিশ্বাস করার কোনো মূল্য নাই।

আমাদের বোধ-জ্ঞান-বিবেচনা-যাচাইয়ের সীমা কতটুকু?

আমাদের বোধ-জ্ঞান-বিবেচনা-যাচাইয়ের সীমা যতটুকুই হোক তা শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ বিবেচনায় শুধুমাত্র স্বীয় ব্যক্তিগত বুঝজ্ঞানের উপর নির্ভর করা অযৌক্তিক। আবার পরম সত্যকে পাওয়ার জন্য নিজ বুঝজ্ঞানকে বাদ দিতে হবে— এটিও অগ্রহণযোগ্য একটা প্রান্তিকতা। যখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাই তখন তার প্রেসক্রিপশনের উপর আপাতদৃষ্টিতে অন্ধভাবে বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু তিনি ভালো ডাক্তার কিনা তা যাচাই করেই আমরা তার কাছে যাই। দর্শন বিষয়ে উপরের আলোচনায় বলেছি— যখনই আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেই তখন যাচাই করেই সেই সিদ্ধান্ত নেই। আবার যাচাই করা মানে একেবারে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা নয়। আমরা যুক্তি ও সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি। যখন আমরা চোখে দেখি তখনও আমরা চোখের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি।

রাসূলকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করতে হলে বুঝজ্ঞান লাগবে। রেসালাতের সত্যতায় নিশ্চিত হওয়ার পর বাকিটুকু বিশ্বাসের বিষয়। এবং এটিই যৌক্তিক। ব্যবহারিক জীবনে কোনো এক্সপার্টের বিষয়ে আমরা যা করে থাকি। গাড়ির ড্রাইভার হতে শুরু করে ডাক্তার পর্যন্ত সবার সাথে। এসব ক্ষেত্রে সর্বদাই আমরা স্বীয় বুঝজ্ঞানের উপর থাকি, এমনকি যখন আমরা কাউকে কোনো বিষয়ে আমাকে গাইড করার উপযুক্ত বিবেচনা করে তার নির্দেশনাকে বিনাবাক্যে গ্রহণ করি, তখনও।

জ্ঞানতত্ত্ব ও ঈমান তথা ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব

প্রচলিত পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব হলো দ্বন্দ্ববাদী। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি— এ দুটি পক্ষ। কারো মতে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা যে জ্ঞান দেয় সেটি অপরাপর যে কোনো জ্ঞানের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য জ্ঞান। আবার বুদ্ধিবাদীদের মতে, কখনো কখনো বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান পাই তা-ই সঠিক বা বেটার নলেজ। পাশ্চাত্যের কেউ কেউ স্বজ্ঞার

কথা বলেছেন বটে, তবে তারা স্বজ্ঞাকে যতটা সম্ভব সযতনে এড়িয়ে গেছেন। কমনসেন্স নামে কেউ কেউ একে বেনামে স্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে, ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব সমন্বয়বাদী। এর সর্বনিম্ন স্তর হলো ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। এর উপরে বুদ্ধি। এর উপরে স্বজ্ঞা বা ইলহাম। স্বজ্ঞার পূর্ণতা তথা পারফেকশন হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ। শুধুমাত্র নবীগণই জ্ঞানের এই সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারেন। আমাদের জ্ঞানতত্ত্বে ওহীর পর্যায় হলো যৌক্তিক প্রকল্প। এবং একমাত্র যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক (র্যাশনাল) সম্ভাবনা হওয়ার কারণে একে প্রমাণিত ও সত্য হিসেবে আমরা গ্রহণ করি। যদি প্রত্যাদেশকে স্বীকার করা না হয় তাহলে স্বজ্ঞার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা যায় না।

মূলকথা হলো, আমরা যখন প্রত্যাদেশ-নিঃসৃত কিছু বিশ্বাস করি তখন আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই তা বিশ্বাস বা গ্রহণ করি। কেউ যদি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে না করেন তখন তিনি নিজেকে অবিশ্বাসী হিসেবে আইডেন্টিফাই করেন।

বিশ্বাসী তথা ঈমানদারদের বেলায় জ্ঞানের এই চার স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্যতার দিক থেকে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তেমনটি হলে তিনি ওহীর জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও ওহীবহির্ভূত সব সূত্রকে পুনর্মূল্যায়ন করবেন। এতদসত্ত্বেও, একজন মুমিনের এ ধরনের অভিজ্ঞতা ও বুঝজ্ঞান তার জ্ঞানের উৎস হিসেবে বাতিল (nullified) হয়ে যায় না। কারণ, তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা ও বুঝজ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যাদেশকে সর্বোচ্চ মান হিসেবে পেয়েছেন ও গ্রহণ করেছেন। যেসব বিষয়ে কোনো ঐশী জ্ঞানের কথা সরাসরি বলা নাই, সেক্ষেত্রে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এটি দ্বন্দ্ব নয়, সমন্বয়।

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা ও স্বরূপ

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্লেটোর প্রস্তাবনা অনুসারে পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানের প্রচলিত সংজ্ঞা হলো— knowledge is justified true belief। ১৯৬৩ সালের পর থেকে এই সংজ্ঞাকে মেরামত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেটি অন্য প্রসঙ্গ। মূলকথা হলো, বিশ্বাস ছাড়া জীবন অসম্ভব, সে বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন। সকল জ্ঞানই মূলত বিশ্বাস হলেও বিশ্বাস মাত্রই জ্ঞান নয়। শুধুমাত্র সেসব বিশ্বাসই জ্ঞান হিসেবে গৃহীত হবে, যা যাচাইকৃত ও সত্য হবে। এছাড়া নিছক বিশ্বাস স্পষ্টতই অন্ধ বিশ্বাস।

বিশ্বাস হলো যা জানি না, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হিসেবে কোনো কিছুকে স্বীকার করা— শুধুমাত্র এটুকু বললে ভুল বোঝা সম্ভব। আসলে বিশ্বাস হলো— যা জানি, তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অজানা সম্পর্কে সর্বোত্তম ও যৌক্তিক অনুমান করে তা সত্য হিসেবে

গ্রহণ করা। এভাবেই আমরা ‘গড অফ দ্য গ্যাপস’ নামক নাস্তিকতার যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারবো। আল্লাহর সত্তাকে আমরা জানি না বটে, তবে আমরা যা জানি সেসবের জ্ঞানগত যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহর অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি রেসালতকে না মানা হয়। এ ধারায় সব কিছু যা ইসলামে আছে বা ইসলামের মূলকথা।

When the declaration of the *Kalima* is a rational conclusion then it is worthy enough. Mere utterance of *Kalima* is totally useless. Rationality, any sort of rationality is nothing but doing philosophy. Where any argument is not working, it has to be shown with healthy argument that why argumentation is not applicable there. Trust on and submission to authority(ies) is a must for our life to continue, no matter what is/are that/those authority(ies).

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

আবু সাইফ: আপনি বলেছেন, “ঈমান বা বিশ্বাস হলো বুঝজ্ঞান অনুসারে পাওয়া একটা সিদ্ধান্ত বা উপসংহার। না বুঝে বিশ্বাস করার কোনো মূল্য নাই।”

ব্যাপারটা আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। পৃথিবীতে এমন অসংখ্য মানুষ আছেন যারা ‘মুখলিস’ বটে, কিন্তু না বুঝেই দ্বীনের অনুসরণ করেন, বোধশক্তি খুবই সাধারণ, কোনোমতে টেনেটুনে জীবনটা চালিয়ে নেন। তাঁদের ‘বিশ্বাসের কোনো মূল্য নাই’ এ কথায় একমত হই কী করে?

আসলে খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, আর একটু ব্যাখ্যা দরকার। কী জানি! হয়তো অন্য পাঠকরা সবাই বুঝতে পারছেন, আমি অধম অক্ষম...

ধন্যবাদ এমন গুরুত্বপূর্ণ পোস্টের জন্য।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জ্ঞানকে যদি আমরা অক্ষরজ্ঞান ও জটিল বিশ্লেষণের উপস্থাপনা হিসেবে না ধরে বুঝ তথা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিসেবে ধরি তাহলে আপাত অবুঝরাও মূলত অবুঝ নন। সর্বনিম্মমানেরও নিচের অবুঝ হলে তিনি ইসলামকে বুঝতেন না, গ্রহণ করতেন না। অবশ্য, শুধুমাত্র জন্মসূত্রে মুসলিম যারা, তাদের কথা আমি ভাবছি না।

মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

নোমান সাইফুজ্জাহ: আমার একটা বিষয় জানার ছিলো। যারা ওহীর জ্ঞানে বিশ্বাস করেন না। তারা কীভাবে সত্য লাভ করেন? বা ওহীর জ্ঞান সত্যের একমাত্র উৎস কিনা? ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যা আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কারা কারা দিয়েছেন? মুসলমানরা বর্তমানে দর্শন চর্চায় পেছনে পড়ে আছে কেন?

“আমাদের কাছে জ্ঞান দু’ধরনের- নাযিলকৃত জ্ঞান বা ওহী (revealed knowledge) এবং অর্জিত জ্ঞান (acquired knowledge thorough scientific method)।”

এই বক্তব্যটি একটু বিশ্লেষণ করুন।

“দর্শন শাস্ত্রের জনক ও অনুসরণকারীদের কাছে ওহীর জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা তাদের চিন্তাপ্রসূত ধারণা দিয়ে সত্য উপলব্ধি করেন।

ঠিক এ কারণেই আমাদের উলামারা দার্শনিকদের বিরোধিতা করেছেন। অ-বস্তু সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য আমরা শুধু ওহীর দ্বারস্থ হই, কোনো দার্শনিকের নই।”

এই বক্তব্যটিও একটু বিশ্লেষণ করুন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির দ্বন্দ্বের মতো রিভিল ও ইম্পিরিক্যাল নলেজের এই দ্বন্দ্ব অমূলক। ইম্পিরিক্যাল নলেজ যেখানে অসম্ভব সেখানেই শুধু রিভিল নলেজের প্রসঙ্গ আসে। জ্ঞান চর্চার শুরুতে ওহীর জ্ঞান অ-প্রত্যক্ষ (ফাউন্ডেশনাল), কিন্তু শেষে অবভিয়ার্স তথা চূড়ান্ত প্রাপ্তি (কনক্রিট ফাইন্ডিংস)।

আল্লাহ তো বলেছেন- তুমি তোমার সকল (ইম্পিরিক্যাল) ক্ষমতা দিয়ে দেখো আমি আল্লাহ কিনা। তোমার যৌক্তিকতার দাবি হলো আমাকে স্বীকার করে নেয়া। অতএব, আমার কথা মানো। আমার রাসূলকে মানো।

দেখুন, আল্লাহ নিজেকে চাপিয়ে দেন নাই। বরং নিজের অথরিটির পক্ষে কোরআনের ছত্রে ছত্রে যুক্তি দিয়েছেন, বিচার-বিবেচনা ও বিবেকের কথা বলেছেন। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা রিচুয়ালসের বিষয়গুলো ছাড়া সব বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তায়াল্লা সংশ্লিষ্ট নির্দেশনার পক্ষে যুক্তিও তুলে ধরেছেন।

আলেমগণ কেন দার্শনিকদের বিরোধিতা করেছেন, সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে দার্শনিকদের বিরোধিতা করে ‘দর্শনের খণ্ডন’ নামক কিতাব লিখে আবু হামিদ আল গাযালী নামের একজন আপাদমস্তক আলেম শ্রেষ্ঠতম মুসলিম

দার্শনিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। সুতরাং, সমস্যাটা উলামা বনাম দার্শনিকদের; দর্শন বনাম ইসলামের নয়।

মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

নোমান সাইফুল্লাহ: আরেকটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন। মনে করুন, হেইডেগার বা বার্টান্ড রাসেল- তাঁরা তো অমুসলিম, একজন আবার নাস্তিক। এই ক্ষেত্রে কে কীভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করবেন। কারণ, একজন অমুসলিম বা নাস্তিক তো ওহীর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সত্য খোঁজে না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ওহী পর্যন্ত যে পৌঁছতে পারলো সে পূর্ণাঙ্গ সত্যকে পেল। যে পৌঁছতে পারলো না তার সত্যতাপ্রাপ্তি খণ্ডিত ও অপূর্ণ থাকলো। সে জন্য পদ্ধতি অর্থাৎ দর্শনের কিছু যায় আসে না।

ধন্যবাদ।

নোমান সাইফুল্লাহ: বিষয়টি আরেকটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য বলছি। ধরুন, একজন অমুসলিম যদি আপনার এ কথাকে দর্শনের ভাষায় অস্বীকার করেন, তার উত্তর কী হবে? এই বিষয়ে আমি খুবই অজ্ঞ। তারপরও আমি জানতে চাচ্ছি, কোনো মুসলিম দার্শনিক কি গবেষণায় প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে সত্যের শেষ স্তর ওহী? এবং তা আধুনিক দর্শন স্বীকার করে নিয়েছে? জানালে উপকৃত হতাম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যিনি মানছেন না তাকে আপনার যুক্তি বলবেন। মানা বা না মানা তার বিবেচ্য।

মুসলিম দর্শনে ওহীর স্থান স্বীকৃত। ওহীর স্বরূপ, বিশেষ করে বুদ্ধির সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়।

ধন্যবাদ।

লোনার: ‘ফালসুফা’ হচ্ছে ইসলামের এন্টিথিসিস। ইসলামকে দর্শন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করার জন্য আপনাকে সচেতন মাইনাস!!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আগের পর্বে দর্শন সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্য ও বর্তমান পর্বে উপস্থাপিত বক্তব্যের আলোকে আপনার বক্তব্য আশা করছি।

থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিন্থেসিসের থিওরিটা হেগেলের, যা তার ছাত্র মার্ক্সের নামে প্রচারিত। আপনি হেগেল-মার্ক্স অনুসারে ইসলাম ও এর সাথে দর্শনের সম্পর্ককে দেখছেন। কী আর বলবো!

মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

আবুসামীহা: “ইসলাম হলো দার্শনিকতার উৎকৃষ্টতম ফসল। দর্শনের মূলকথা হলো ইসলাম।”

দর্শনের জনক গ্রীকরা। তাহলে তারাও ইসলাম চর্চা করতো! এরিস্টটল, সক্রেটিস, প্লেটোরাও তাহলে আমাদের ইসলাম শিখিয়েছেন!

রসূলুল্লাহ (সা) ফালসাফা (ফিলোসফি) চর্চা করেননি হেরা গুহায়। তিনি তাফাকুর করেছেন। রসূলুল্লাহর (সা) জন্মের আগে থেকেই ফালসাফা প্রচলিত ছিলো।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: পাশ্চাত্য দর্শনের যে ইতিহাস পড়ানো হয় তাতে গ্রীসের আইওনিয়ার অধিবাসী থেলিসকে দর্শনের জনক বলা হয়। আপনি ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু যা আপনার বক্তব্যে আসেনি তা হচ্ছে প্রাচ্য দর্শনের দুটি ধারা স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়েছে। একটি গ্রিসের আগে, ভারতীয় দর্শন। অন্যটি আরবে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে হযরত হাসান বসরীর হাতে। উনার সহীফা নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. মো: বদিউর রহমান একটি সাড়া জাগানো থিসিস করে দেখিয়েছেন যে মুসলিম দর্শন আর ইসলাম একইসাথে এসেছে। বাহিরের প্রভাবে তার উৎপত্তি হয়নি। উনার লেখা বইটি বাজারে পাওয়া যায়।

দর্শন হলো চিন্তার একটি পদ্ধতি। যাতে বুদ্ধি ও বোধের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা হয়। যুক্তি এর হাতিয়ার। আপনার ব্যবহৃত তাফাকুরকে বলা যায় এর চালিকাশক্তি।

আগের পর্বে এটি বলেছি- দর্শন যে কোনো মত বা পথের ভালো-মন্দ, পক্ষ-বিপক্ষ, যুক্তি-পাল্টাযুক্তিকে তুলে ধরে। তাই দর্শন সর্বদা নিরপেক্ষ। কিন্তু যে কোনো দর্শন চর্চাকারী (প্রতিটা ব্যক্তিই প্রতি মুহূর্তে দর্শনচর্চা করে থাকেন, যখনই সে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে) কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না। তিনি কোনো না কোনো যুক্তিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করবেন। এমনকি কিছু না বলাকেও তিনি প্রেফার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি উইথহোল্ডিংয়ের পক্ষে! আর দর্শন বিষয়ে পাঠদানকারীর

দায়িত্ব হচ্ছে পক্ষ-বিপক্ষকে তুলে ধরা ও নিজের প্রেফারেন্সকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া। এ দৃষ্টিতে প্রফেটরা ফিলোসফি শিক্ষা দেন না। কারণ, তাঁদের সুনির্দিষ্ট পক্ষ থাকে, যাকে তাঁরা একমাত্র সত্য হিসেবে প্রচার করেন। সুতরাং, প্রফেটগণ দার্শনিকদের (শিক্ষক অর্থে) মতো নিরপেক্ষ নন। যদিও তাঁদের সত্যপ্রাপ্তি ও তা প্রচার-প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হচ্ছে দর্শনেরই পদ্ধতি।

আপনি ইমাম গায়ালীর উদারহণটিই দেখুন। তিনি কখনো নিজেকে দার্শনিক পরিচয় দেয়া তো দূরের কথা, উল্টো গ্রীকদর্শন প্রভাবিত তৎকালীন দার্শনিকদের ২০টি দাবির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সেগুলো ঠিক নয়। বইয়ের নাম দিয়েছেন, তাহাফাতুল ফালাসিফা। অথচ, উনাকেই শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক মনে করা হয়। কেন? কারণ বিষয়গুলোকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। শুধুমাত্র কোরআন-হাদীসের রেফারেন্স দিয়েই ক্ষান্ত হননি।

কোরআন কোনো দার্শনিক গ্রন্থ নয়, যেভাবে আমরা কোনো দার্শনিকের লেখা বই পড়ে থাকি। এটি ওহী। এই ওহীকে স্টাবলিশড করা হয়েছে যুক্তি-তত্ত্ব ও দার্শনিকসুলভ পদ্ধতি ও প্রমাণ দিয়ে।

এতে মানুষের পরিচিত জগত ও সাদামাটা বিষয়গুলোকে বারংবার ও নানাভাবে রেফার করা হয়েছে সেসব নিয়ে মুক্তমনে চিন্তা গবেষণা করার জন্য। এটিই তো এম্পিরিক্যাল স্টাডি। তাই না? মানুষের চিন্তনকে গাইড করে একে ঐশী বাস্তবতার দিকে চালিত করা হয়েছে।

যেসব দার্শনিক ঐশী স্তরে পৌঁছতে পারেননি, সেটি তাদের সীমাবদ্ধতা, দর্শনের নয়। কারণ, যারা জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর তথা ঐশী জ্ঞানে পৌঁছতে পেরেছেন, তারা সুশৃংখল চিন্তা-পদ্ধতির মাধ্যমেই সেটি পেরেছেন। আল্লাহর রাসূলও (সা) এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। হেরা গুহায় তিনি কী করছিলেন সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। শুধু এটুকু জানি যে তিনি ভাবছিলেন। আচ্ছা, তিনি কী ভাবছিলেন? এটি নিশ্চিত যে তিনি নিজ স্বার্থ নিয়ে ভাবছিলেন না। তাঁর ভাবনার বিষয় ছিলো জগত, সমাজ, সমগ্র। সূরা ইনশিরাহর ২-৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদুদী এ কথাই বলেছেন। তাই না?

হ্যাঁ, ফালাসাফা রাসূলের (সা) জন্মের আগে থেকে প্রচলিত ছিলো, তবে এই নামে ছিলো না। যখন থেকে মানুষ নিজ বুদ্ধি-জ্ঞান দিয়ে কোনো কিছু

জানতে চেয়েছে, প্রশ্ন করেছে; তখন থেকে এই চিন্তা ও জ্ঞানগত প্রক্রিয়াও অস্তিত্ব লাভ করেছে।

ফিলোসফি মানে ‘জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ’; ফিলোস মানে জ্ঞান, সোফিয়া মানে অনুরাগ। এটি কীভাবে ইসলামবিরোধী হতে পারে? হতে পারে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অন্য অনেক কিছুর মতো ইসলামের পক্ষের লোকেরা এসব ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছেন না বলে ইসলামবিরোধীরা উপরের এক মন্তব্যকারীর ব্যবহৃত শব্দ ‘এন্টিথিসিস’ হিসেবে একে কাজে লাগাচ্ছে।

ইসলামই হচ্ছে মুক্তবুদ্ধি চর্চার মূল ক্ষেত্র। দার্শনিকতার সর্বোত্তম পরিণতি হলো ইসলাম। “রা’সুল আমরি আল-ইসলাম”-এর এটিই মর্মার্থ।

মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। দীর্ঘ প্রতিমন্তব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

৩০ জুলাই, ২০১১

<https://dorshon.com/muslims-misconception-about-philosophy>

Everyone does philosophy.
But only a few are aware of doing it.

জীবন ও জগত সম্পর্কিত কোনো বিষয় ফিলোসফির বাইরে হতে পারে না

জীবন ও জগত সম্পর্কিত কোনো বিষয় ফিলোসফির বাইরে হতে পারে না। ইসলাম হলো ফিলোসফির অনেকগুলো প্রাপ্তি বা আউটকামের মধ্যে অন্যতম। ইসলাম ছাড়া অপরাপর মত, পথ ও তত্ত্বসমূহও ফিলোসফির দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত ও সেই হিসেবে সমভাবে গ্রহণযোগ্য।

যদিও আমার মতো আরো অনেকের দৃষ্টিতে ইসলামই হচ্ছে জীবন ও জগতের মৌলিক প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর ও সমাধান।

ফিলোসফির দুটি দিক:

- (১) জীবন ও জগতের মৌলিক প্রশ্নগুলোকে যুক্তি দিয়ে ডিল বা মোকাবেলা করার পদ্ধতি।
- (২) জীবন ও জগতের মৌলিক প্রশ্নগুলো উন্মুক্ত যুক্তিভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে বিশেষ কোনো সমাধানে উপনীত হওয়া।

এর প্রথমটি হচ্ছে ফিলোসফির মূল জায়গা। যুক্তির গঠনকাঠামো, যাকে আমরা বিবেক-বুদ্ধি হিসেবে বলি, তা সবার জন্যই সমান। খোদা বা প্রকৃতি প্রদত্ত। যদিও সবাই এটিকে সমানভাবে কাজে লাগায় না।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে এর পরিণতি বা আউটকাম। যুক্তিকে যে যেভাবে কাজে লাগায় সে সে-ধরনেরই এক্সপেক্টেড আউটকাম বা পরিণতিতে পৌঁছায়।

ইসলাম ছাড়াও জীবন ও জগতের মৌলিক প্রশ্নগুলোর যুক্তিসঙ্গত উত্তর আরো অনেক কিছু হতে পারে। যেগুলো হলো ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শ।

মূলত সমান হওয়া সত্ত্বেও সব যুক্তি সবার কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তাই প্রত্যেকে একই ফিলোসফিক্যাল ওয়েতে তথা একই ধরনের যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে বিচার বিবেচনা করার পরও যার যার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমরা এক একটি বিশেষ মত, পথ ও তত্ত্বকে অপরটি তুলনায় প্রাধান্য দিয়ে থাকি। অবশেষে সেটাকেই একমাত্র সঠিক বলে গ্রহণ করি। নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য যুক্তিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করি।

ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গি হতে প্রয়োগের কারণে একই যুক্তিপদ্ধতির ফলাফল বিভিন্ন রকমের হওয়াটা আমাদের জীবনবোধ তথা meta-theory or paradigm of life-এর উপর নির্ভর করে।

উপরের এ কথাগুলো বলেছি, “যুক্তির বাইরে কিছু নয়, বুদ্ধির অনুকূলে আমরা সর্বদা- কথাটির মানে কী?” (<https://freethoughts.dorshon.com/discussion-on-in-favour-of-reason>) শিরোনামে আমার একটি সাম্প্রতিক পোস্টে একজন সম্মানিত পাঠকের মন্তব্যের জবাবে।

উক্ত পাঠকের মন্তব্যটি হলো:

“ইসলামের সবকিছু যে ফিলোসফিভিত্তিক হতে হবে, তা কিন্তু নয়। বরং ইতিহাস সাক্ষী, যখনই কেউ ইসলামের কোনো কিছু ফিলোসফির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে আল্লাহর সীফাত সংক্রান্ত বিষয়গুলো, সেক্ষেত্রে সালাফদের নীতি থেকে সরে এসেছে। আর, ইসলামের প্রতিটি শাখা ব্যাপক। সুতরাং, এর স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে হলে ব্যাপক পড়াশোনা প্রয়োজন। যেমন প্রয়োজন একজন মানুষকে ফিলোসফি নিয়ে কথা বলতে হলে।”

২১ জানুয়ারি, ২০১৯

<https://dorshon.com/there-is-nothing-beyond-philosophy>

ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর

ভূমিকা

ইসলাম আসলে কী? অথবা, প্রচলিত অর্থে ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিকল্প হিসেবে ইসলামের কি আলাদা কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা হতে পারে? হলে সমস্যা কী? তাহলে কি ‘ইসলামী দর্শন’ কথাটা আদতে ভুল? তাই যদি হয়, এতো এতো মুসলিম দার্শনিকরাই বা কী করেছেন? ইমাম গাজ্জালী বা আল্লামা ইকবালের ‘ইসলামী দর্শন’ কি প্রমিনিয়ান্ট দর্শন হিসেবে স্বীকৃত নয়? এসব প্রশ্নের ‘ইঙ্গিতমূলক’ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত উত্তর নিয়েই এই নিবন্ধ।

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ আসলে ইসলামের প্রচলিত ব্যাখ্যাপদ্ধতি কী- তা নির্ণয় করাও প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়াবে। ইসলামকে জানা-বুঝা ও এর ব্যাখ্যা-ভাষ্য রচনার প্রচলিত পদ্ধতিটা হচ্ছে ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতি। আমরা জানি, কোনো ধর্ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মগুরুর সিদ্ধান্তের প্রতীয়মান অর্থ অনুসারে ধর্মের নানা বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া ও ভাষ্য রচনার যে পদ্ধতি, তা-ই হলো ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতি। ধর্মগ্রন্থে যা বলা আছে এবং ধর্মবেত্তাগণ তা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মূলগত দিকটা অক্ষুণ্ণ রেখেই ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য তৈরি হয়।

ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত, প্রচলিত এবং প্রায়শই আক্ষরিক অর্থের বাইরে ধর্মের বিষয়সমূহকে (notions or issues) যুক্তি ও বুদ্ধির নিরিখে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করাকে ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সোজা কথায়, ধর্মের বিষয়গুলো নিয়ে দর্শন চর্চা বা ধর্মকে দর্শনের আলোকে দেখাই হচ্ছে ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যাপদ্ধতি।

ব্যাপারটা তাহলে দর্শনের সংজ্ঞায় এসে ঠেকলো। তাই না? মজার ব্যাপার হলো, পৃথিবীর তাবৎ দার্শনিকরা একমত হয়েছেন, দর্শনের এমন কোনো সংজ্ঞা নাই। বলা

যায়, দার্শনিকরা (দার্শনিক হিসেবে) যা করেন, যেভাবে করেন, তা-ই দর্শন! এক একজন দার্শনিক দর্শনের এক একটি দিকের ওপর গুরুত্বারোপ করে দর্শনের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সেসব বিতর্কে না গিয়ে দর্শনের লক্ষণগত একটা সংজ্ঞা বা পরিচয় এভাবে হতে পারে: কোনো মৌলিক বিষয়ের তত্ত্বগত দিকসমূহকে যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করা। অন্য কথায়, যে কোনো প্রশ্নকে গ্রহণ করা ও তাত্ত্বিক যুক্তি (logical argument) দিয়ে নিজের কথা তুলে ধরা।

ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বাইরে ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যা হতে পারে কিনা- এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। আমার মতে, ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক দু'ধরনের ব্যাখ্যাই হতে পারে। ইসলামের দিক থেকেও তা হতে পারে, ইসলামের বাইরের দিক থেকেও তা হতে পারে। ইসলামের ভেতর থেকে ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার অনুমোদন থাকার মানে হলো- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর পক্ষে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিগুলো কী, তা আলোচনা করা। যেমন: তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত ইত্যাদির পেছনে কী ধরনের দার্শনিক যুক্তি রয়েছে, তা আলোচনা করা। এক্ষেত্রে দার্শনিক ব্যাখ্যা ও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পরস্পর পরিপূরক (complementary) হিসেবে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ হিসেবে ইমাম গাজ্জালীর ‘তাহাফাতুল ফালাসিফা’র কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর বিবেচনায়, তৎকালীন মুসলিম দার্শনিকদের গৃহীত ‘ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক’ ২০টি অনুসিদ্ধান্তকে তিনি দার্শনিক যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। ধর্মের বিষয়গুলোকে নিছক ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণের প্রচলিত পদ্ধতির (ফকীহদের পদ্ধতি) পরিবর্তে দার্শনিকদের প্রমাণ-পদ্ধতিতেই তিনি ইসলামের মূল বিষয়গুলোর সমর্থনে যুক্তি দিয়েছেন। এমন নয় যে, এতে তিনি কোরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দেন নাই। কোরআন-হাদীসের রেফারেন্স উভয় পদ্ধতিতেই ব্যবহৃত হয়। তফাৎ হলো, ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তা ‘দোহাই’ বা অবশ্য-মান্য হিসেবে আসে, আর দার্শনিক পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট রেফারেন্সের গুরুত্ব অনুসারে তা ‘যুক্তি’ হিসেবে আসে। ইমাম গাজ্জালী নিজেকে কখনো দার্শনিক ভাবেন নাই। বইয়ের নামই দিয়েছেন, ‘দর্শনের খণ্ডন’! অতএব, বুঝা গেলো, কোনো কিছু দর্শন হয়ে ওঠা সেটির উপস্থাপনা-পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। ইমাম গাজ্জালীর দর্শন এই অর্থে একটি যথার্থ দর্শন। অতএব, ইসলামী দর্শন বা এর দার্শনিক ব্যাখ্যা আলোচ্য অর্থে সম্ভবপর এবং তা ইসলামের দিকে থেকে গ্রহণযোগ্যও বটে। বরং বলা যায়, ইসলামী দর্শন ইসলামের একটি অপরিহার্য দিক।

সমস্যা হলো ইসলামী ধর্মতত্ত্বের আওতাবহির্ভূত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ‘দার্শনিক ব্যাখ্যা’র গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। ধরা যাক, এ রকম একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা-পদ্ধতিতে ইসলামকে অর্থাৎ ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করা হলো। যেহেতু এটা ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দর্শন চর্চা, তাই এটি এক অর্থে ইসলামী দর্শনও বটে।

ইসলামকে যিনি সমর্থন করেন তাকেও ইসলামিস্ট বলা যায়। আবার ইসলামকে যিনি ইসলামের ভেতরকার দিক থেকে মানেন না বা সমর্থন করেন না; কিন্তু ইসলাম নিয়ে কাজ করেন তিনিও নিজেই ইসলামিস্ট দাবি করতে পারেন। অতএব, ইসলাম নিয়ে চর্চিত দর্শনমাত্রই ইসলামী দর্শন, হোক তা ইসলামকে সমর্থন করে কিম্বা তা না করে। ইসলামকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ না করে এর কোনো বিশেষ বিষয়কে (notion অর্থে) গ্রহণ করে বা তাকে ভিত্তি ধরেও দর্শন চর্চা হতে পারে। ইসলামকে locate করার সুনির্দিষ্ট বা অনতিক্রম্য (specific or predefined) কোনো ‘ইসলামী’ পদ্ধতি আছে কিনা এবং সেখানে কোন ধরনের দার্শনিক পদ্ধতির স্থান কী রকম- তা নিরূপণ করাই এই আলোচনার মূল বিষয়।

ইসলাম নিয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দর্শন চর্চার সমস্যা

আমরা জানি, ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ববাদ (unicity of God)। তাওহীদের ধারণা স্রষ্টার অস্তিত্ব, এককত্ব এবং তাঁর সে সমস্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত। ইসলামী ধর্মতত্ত্বে ইসলাম-এর মৌলিক বিষয়গুলো যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যায় তা যদি বাহ্যিক ও মর্মগত দিক থেকে হুবহু স্বীকার ও প্রত্যয়ন করা না হয় তাহলে দু’ধরনের সমস্যা হতে পারে:

- ১। ধর্মতাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত অর্থের বিপরীত অর্থ সাব্যস্ত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সরাসরি অস্বীকার করার নামাস্তর বা কুফর।
- ২। এমন ব্যাখ্যা হতে পারে, যা দৃশ্যত ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাথে বিপরীত না হলেও শেষ পর্যন্ত তা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক। যুক্তি-পদ্ধতির যেমন নানা রকম মান ও মাত্রা রয়েছে; কোনো বিষয়ের ওপর উপস্থাপিত যুক্তিও নানা রকম মান ও মাত্রার হতে পারে। সামগ্রিকভাবে না দেখলে এবং প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করা না থাকলে একই বিষয়ের বিপরীতমুখী ফলাফল হতে পারে। ‘১০-এর মান কত?’ এটি কোনো প্রশ্নই নয়। কারণ, কত দিয়ে কী (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি) করা হচ্ছে, তা পূর্বেই নির্ধারণ না করলে ১০-এর ভিত্তিতে বহু রকমের ফলাফল হতে পারে।

আরেকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। মনে করুন, কেউ যুক্তি দিয়ে বললো- যেহেতু আল্লাহ বলেছেন তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল, অতএব আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মানুষকে তিনি দোষখে দিতে পারেন না। স্থায়ীভাবে দোষখে জ্বালানোর কথাগুলো মূলত রেটরিক। নিছক ভয় দেখানোর জন্য সেগুলো বলা হয়েছে! এহেন যুক্তি বা যুক্তিধারা দর্শনসম্মত হলেও ইসলামসম্মত নয়। আমরা জানি- নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, হুদুদ ইত্যাদিসহ ইসলামী শরীয়াহর প্রতিটি বিষয়ের পেছনে কোনো না কোনো যুক্তি, উদ্দেশ্য বা মর্মার্থ

রয়েছে, যা মানুষ চিন্তা করলে বুঝতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সেসব কারণ বা যুক্তির কথা উল্লেখও করেছেন। যেমন- নামাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটি মানুষকে অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এখন এই আয়াতকে ভিত্তি ধরলে যিনি অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করেন, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্য নামাজ পড়ার বাধ্যবাধকতা বহাল থাকে না। অথচ, নামাজ-রোজাসহ সকল ইবাদতের বিষয় এ জন্যই ফরজ যে আল্লাহ তা হুকুম করেছেন। যুক্তির সমর্থন বা উদ্দেশ্যের বিষয়গুলো পরিপূরক মাত্র। অতএব, ইবাদতের বিষয়গুলোকে মূলত ‘আল্লাহর হুকুম, তাই মান্য’- এভাবে গ্রহণ করা না হলে ইসলামের দিক থেকে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ভাষ্য তৈরির বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য

ইসলামের দিক থেকে ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সদাসর্বদা কি অভিন্ন? না, তা নয়। তাহলে ইসলামসম্মত দার্শনিক ব্যাখ্যার সাথে আলোচ্য ইসলাম কর্তৃক অসমর্থিত দার্শনিক ব্যাখ্যা-ভাষ্যদান পদ্ধতির ফারাকটা কোথায়? ব্যাখ্যা-ধারার বৈপরীত্য অর্থে ভিন্নতা (contradiction in interpretation) এবং বৈচিত্র্য অর্থে ভিন্নতার (plurality in interpretation) মধ্যে এই ফারাক নিহিত। বৈপরীত্য এক প্রকারের ভিন্নতা, আবার ভিন্নতাকেও এক অর্থে বৈপরীত্য বলা যায়। তবে এখানে ভিন্নতা ও বৈপরীত্যকে আমরা আলাদা করেই বুঝবো। একই পথের ডান পাশ, বাম পাশ ও মাঝখান বরাবর চলা- এই তিন ধরনের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, বৈপরীত্য নেই। একটি নির্দিষ্ট ধারার ব্যাখ্যা পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যার বৈচিত্র্য অর্থে ভিন্নতা হতেই পারে। উল্টোভাবে, ভিন্ন আঙ্গিক বা ভিন্ন যুক্তিতে ভিন্নতার প্রক্রিয়ায় অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। এসবই হলো ইসলামের মধ্যে দার্শনিকতার ক্ষেত্র বা অবকাশ (scope of philosophy in Islam)। দার্শনিকতার অবকাশ থাকা মানে দর্শন চর্চার ইতিবাচক সম্ভাবনা। আবার ইসলাম ‘অনুমোদিত’ অবকাশকে অতিক্রম করে মুক্তভাবে দর্শন চর্চাও এক প্রকারের ইসলামী দর্শন চর্চা। এই উভয় প্রকারের দর্শন চর্চার পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক ও স্বচ্ছ ধারণা ব্যতিরেকে ইসলামী দর্শনের ক্ষেত্র, সম্ভাবনা ও সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

দর্শন ও ডগমার ডিলেমা

এখানে স্বয়ং দর্শন সম্পর্কেই অধিকতর মৌলিক একটি প্রশ্ন এসে পড়ে। ইসলাম প্রসঙ্গে হোক বা অন্য কোনো বিষয়েই হোক, কোনো ধরনের আশুবাধ্যকে (dogma) অলংঘনীয় বা ‘মৌলিক বিষয়’ হিসেবে অক্ষুণ্ণ রাখার শর্ত চাপিয়ে দিয়ে, সোজা কথায় চিন্তার সীমারেখা টেনে দিয়ে যুক্তি চর্চার নামে যা হবে, তা কি আদৌ দর্শন হবে? আপাতদৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত জটিল ও অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন।

বিশেষ করে, যারা দর্শনকে দর্শনের ভেতর থেকে দেখেননি তাদের কাছে এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন।

আচ্ছা, দর্শনে এমন কোনো তত্ত্ব, মতবাদ, যুক্তিধারা বা এমন কোনো দার্শনিক চিন্তাধারা আদৌ কি আছে বা হতে পারে, যা কোনো না কোনো পূর্বানুমানকে (pre-supposition) অবলম্বন করে সেটিকে বা সেগুলোকে স্বয়ং-সঠিক (self-justified) হিসেবে গণ্য না করে দাঁড়িয়েছে? এর উত্তর হ্যাঁ-সূচক হলে সেই তত্ত্বটির নাম কি? আদতে এ রকম তত্ত্ব বা এ জাতীয় কিছু নাই। কিছু বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েই কোনো বিষয়কে যাচাই করতে হয়। বলা যায়, কোনো না কোনো ‘উত্তর’কে ইতোমধ্যে বা যে কোনো প্রকারে গ্রহণ করে নিয়েই ওই বিষয়ে নতুন কোনো প্রশ্ন করতে হবে। Every question does have some ‘answers’ and every answer does have some questions। এই যে ধরে নেয়া, দর্শনের ভাষায় এটাকে বলা হয় নির্বিচারবাদ (dogmatism)। নির্বিচারবাদের বিরুদ্ধে দর্শন, আবার দর্শনই কিছু নির্বিচারের ওপর নির্ভর করে। আশ্চর্যের ব্যাপার! তাই না? আসুন এ বিষয়কে একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করি।

জ্ঞানের উৎস সংক্রান্ত মতবাদগুলোর অন্যতম প্রধান দুটি হচ্ছে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ। মূলধারার (পাশ্চাত্য) দর্শনে এ দুটিই মূলত নির্বিচারবাদ (dogmatism)। কেউ বুদ্ধিকে জ্ঞানলাভের অধিকতর গ্রহণযোগ্য উৎস হিসেবে মনে করলে তিনি বুদ্ধিবাদী। আর কেউ পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে আগত অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের মূল বা প্রাথমিক উৎস গণ্য করলে তিনি অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক গণ্য হবেন। বুদ্ধিবাদ কীভাবে নির্বিচারবাদী হয়? জ্ঞানের উৎস সন্ধান বা যাত্রাপথেই যদি ‘ধরে নেয়া’ হয় যে, বুদ্ধিই জ্ঞানের প্রকৃত বা একমাত্র উৎস; তাহলে তা পথ চলার শুরুতেই গন্তব্যের মূল্যায়ন শেষ করার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একই সমস্যা বা অভিযোগ অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ধারায় আলোচনা করলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এক এক করে সাপ বেরাবে।

তাহলে দর্শনটাই কি সামগ্রিক ও অন্তর্গতভাবে নির্বিচারবাদী! অথচ আমরা জানি, নির্বিচারবাদ এবং দর্শন- উভয়ই পরস্পরকে খণ্ডন করে। ব্যাপার হলো, দর্শনের কোনো চিন্তাপদ্ধতিই আদতে (in its fundamental level) নির্বিচারবাদমুক্ত (non-dogmatic) নয়। বলা যায়, দর্শনের ভিতরকার এই স্ববিরোধী পরিস্থিতিই মানুষের জ্ঞানতাত্ত্বিক নিয়তি (epistemic predicament)। কোনো মাপকাঠির (scale) মাপকাঠি হওয়ার জন্য কোনো আদর্শ মাপ (standard measurement) না থাকা সত্ত্বেও ‘মাপকাঠি’ মাপকাঠি হয়েছে। হওয়াটা ঠিকই হয়েছে। ‘ধরে নেয়া’ ধ্রুবক দিয়েই আমরা যাচাই বা পরীক্ষা করি, অন্তত শুরুর দিকটা তা-ই। ধ্রুবক বা স্বতঃসিদ্ধ, সোজা কথায়, মাপকাঠি সম্পর্কে ‘কেন?’ জাতীয় কোনো প্রশ্ন চলে না। এ ধরনের সার্বজনীন ও মানবিক চিন্তাপদ্ধতির কারণেই জ্ঞান-গবেষণা সম্ভবপর হয়েছে। এই ধরনের

চিন্তাধারার ছাঁচে ফেলেই ‘স্বেচ্ছাচারিতা’কে ‘স্বাধীনতা’র ধারণা হতে আলাদা করে বিবেচনা করা সম্ভব। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা মানেই কোনো না কোনো বিশেষ আঙ্গিকে চর্চা। স্বাধীন মানেই কোনো না কোনো সীমাবদ্ধ জাতীয় ‘কিছুর’ প্রেক্ষিতে স্বাধীন।

দর্শন, দার্শনিকতা ও দার্শনিক

দর্শন কোনো বিষয়েই একপাক্ষিক (biased) বা চূড়ান্ত (conclusive) কোনো কথা বলে না। যেমন, খোদার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে দার্শনিক যুক্তি চার রকমের (category) হতে পারে—

১। মানুষ ও জগতের স্রষ্টা ‘আছে’ বলে যারা মনে করেন তাদের মতটি হলো—
আস্তিকতা (theism)।

২। স্রষ্টা ‘নাই’ যারা মনে করেন তাদের মতটি হলো—
নাস্তিকতা (atheism)।

৩। মানুষ ও জগতের একজন বা একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকতেও পারে, নাও থাকতেও পারে; এখনো নিশ্চিত নন বা কখনোই নিশ্চিতযোগ্য নয়, তবে বিষয়টিকে একটি বিবেচ্য বিষয় হিসেবে যারা মনে করেন তাদের মত বা অবস্থানকে বলা যায়—
অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism)।

৪। অপরদিকে মানুষ ও জগতের স্রষ্টা থাকা কিম্বা না থাকা সংক্রান্ত পুরো বিতর্ক ও বিষয়টিকে যারা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন তাদেরকে আমরা নির্বিকারবাদের (irrelevantism) ক্যাটাগরিতে বিবেচনা করতে পারি।

অজ্ঞেয়বাদের সাথে নির্বিকারবাদের পার্থক্য হলো, অজ্ঞেয়বাদ বিষয়টিকে (issue) স্বীকার করে (to take in cognizance)। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদের এই অবস্থানটা হলো ‘not yet’ ধরনের। খোদার অস্তিত্ব প্রশ্নে এ চারটি অবস্থা বা অবস্থান কিংবা মতের সব কয়টিই দর্শন-এর অবস্থান, মত বা তত্ত্ব। এগুলোর আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে ব্যক্তিবিশেষের একটি অবস্থান শেষ পর্যন্ত উঠে আসে। সেটি হতে পারে আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়বাদ কিংবা নির্বিকারবাদ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে কেউ এই সবগুলো তত্ত্বই পড়বেন। তা সত্ত্বেও, দর্শন চর্চাকারী ব্যক্তি তথা একজন দার্শনিকের অবস্থান সব সময়ই কোনো না কোনো একটি মতের পক্ষে থাকে, যেটিকে তিনি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। এমনকি জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে মাঝামাঝি বা নিরপেক্ষ অবস্থানও একটি পক্ষ, সাধারণ ভাষায় যাকে আমরা abstain করা বলি। রেফারি টাইপের কারো জন্য সেটিই সর্বাধিক যুক্তিসম্মত অবস্থান হতে পারে। এ ধরনের চিন্তার সূত্রে IBE’র (Inference to the best explanation) মতো ‘মৌলিক সূত্র’ ব্যবহার করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রশ্নে উপরের যে কোনো একটি পক্ষ, অবস্থান বা মতকে দর্শনসম্মত কিম্বা দার্শনিক মত হিসেবে গ্রহণ এবং

অপরাপরগুলোকে বর্জন করা সম্ভব। আসলে দর্শনে তো কোনো ‘প্রমাণ’ নাই, হতে পারে না। অধিকতর গ্রহণযোগ্য যুক্তিকে (argument) আমরা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ, উপস্থাপন ও অনুসরণ করি।

যাহোক, দর্শন ও দার্শনিকের এই পার্থক্য যদি আমরা বুঝি তাহলে এতক্ষণে এটা খুবই পরিষ্কার যে ইসলামী ধর্মতত্ত্বের আওতাবহির্ভূত ‘দার্শনিক ব্যাখ্যা’ কেন এবং কোন্ যুক্তিতে ইসলামের দিক হতে গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মতাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত ইসলাম-এর আওতার মধ্যে থেকে কীভাবে ‘দর্শনচর্চা’ সম্ভব, তাও উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায়।

আগেই বলেছি, ইসলামের সমর্থন এবং বিরোধিতা- উভয় প্রকারের দর্শনই ‘ইসলামী দর্শন’। সোজা কথায়, ‘ইসলাম নিয়ে দর্শন চর্চা’ মাত্রই তা ইসলামী দর্শন হিসেবে গণ্য হবে। যেমন, মনোদর্শন। যারা বস্তু অতিরিক্ত একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা ‘মন’-এর অস্তিত্ব থাকার পক্ষে যুক্তি দেন, তারাও মনোদার্শনিক। আবার এ ধরনের কোনো ‘মন’-এর অস্তিত্বের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যারা যুক্তি দেন, তারাও মনোদার্শনিক হিসেবে গণ্য। ধর্মদর্শন হলো মূলধারার দর্শনের একটি পরিচিত শাখা। ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা বা খণ্ডন করা- এর কোনোটিই ধর্মদর্শনের কাজ নয়। আবার ধর্মদর্শনের যত আলোচনা তার প্রত্যেকটি শেষ পর্যন্ত ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষেই যাবে। ব্যাপার হলো, ধর্মকে নিয়ে দর্শন চর্চা, তা ধর্মের পক্ষেও যেতে পারে, বিপক্ষেও যেতে পারে। যে কোনো অবস্থাতেই তা দর্শন, যদি তাতে যুক্তির ব্যবহার থাকে। এই যুক্তির উপস্থাপনায় ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স আসতে পারে। তবে তা ধর্মের পদ্ধতিতে অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য-মান্য (dogma) হিসেবে নয়।

ইসলাম ব্যাখ্যার ইসলামসম্মত পদ্ধতি

ইসলামের উন্মুক্ত ব্যাখ্যা-ভাষ্য পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক দুটি উৎস কী বলে, এবার তা খানিকটা খতিয়ে দেখা যাক। ইসলাম স্বয়ং কোরআনকে বুঝা, ইসলামকে মানা বা বুঝা ও ইসলামের ব্যাখ্যাদান পদ্ধতি (way of interpretation) পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন, “পাঁচটি বিষয়ের উপর কোরআন নাযিল হয়েছে: (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মুহকাম, (৪) মুতাশাবিহ ও (৫) আমছাল (বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ঘটনাবলি সংক্রান্ত আয়াত)। সুতরাং, তোমরা হালালকে হালাল জানবে। হারামকে হারাম মানবে। মুহকামের উপর আমল করবে। মুতাশাবিহের উপর ঈমান রাখবে এবং আমছাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।” (মেশকাত শরীফে বর্ণিত ১৭ নং হাদীস)

আরেকটি হাদীসে তিনি বলেছেন, “করণীয় তিন প্রকার: এমন করণীয় যা স্পষ্টতই ভালো, তা পালন করো। এবং এমন করণীয় যা সুস্পষ্টভাবে মন্দ, অতএব তা পরিহার

করো। এবং সেই কাজ যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে, তা মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহর উপর ন্যস্ত করো।” (মেশকাত শরীফে বর্ণিত ১৭৪ নং হাদীস)

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক কোরআনে দুই ধরনের আয়াত রয়েছে: (১) আয়াতে মুহকাম (সুস্পষ্ট আয়াত) এবং (২) আয়াতে মুতাশাবিহ (রূপক অর্থের আয়াত)। এ সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনের আয়াতটি স্ব-ব্যাখ্যাত (self-explanatory)। আল্লাহ বলছেন, “তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কিছু আয়াত ‘মুহকাম’, এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো ‘মুতাশাবিহ’, যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারা ই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহসমূহের পেছনে লেগে থাকে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা গভীর জ্ঞানী তারা বলে, ‘আমরা এগুলোর ওপর ঈমান এনেছি। এসব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত। এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।’” (সূরা আলে-ইমরান ৩:৭)

উল্লেখ্য, “বলো, আল্লাহ অদ্বিতীয়, তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কারো পুত্র নন, কারো পিতাও নন। তার সমকক্ষ কেউ নাই।” কিম্বা, “তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো” ইত্যাদি ধরনের আয়াত হলো মুহকাম আয়াত। আবার “আল্লাহ হলেন আলোর ভিতর আলো [নুরূন আলা নুর]” এ ধরনের আয়াতগুলো হলো মুতাশাবিহ আয়াত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুহকাম আয়াতসমূহকে মান্য করতে হবে। কিন্তু সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফকীহদের মধ্যে যেসব মতানৈক্য হয়েছে, তার কী হবে? আল-কোরআনকে সামঞ্জস্য (consistent) হিসেবে মানবো কিনা, তা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। জীবন ও জগত সম্পর্কে স্থায়ী যুক্তি ও বুদ্ধির দাবিকে মেনে নিয়ে যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে তাদের পরবর্তী কাজ হলো আপাত বিরোধের আড়ালে অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যতাকে খুঁজে বের করা। ফিকাহর ভাষায় যাকে ‘তাহকীক’ বলা হয়। অতএব, ইসলামকে সামগ্রিকভাবে (holistically) গ্রহণ করাটা ইসলামের দিক থেকে অবশ্য কর্তব্য। ইসলামের কোনো একটা বা কয়েকটা দিককে গ্রহণ করে কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করলে তা, এমনকি তার সবকিছু উপাদান, স্বতন্ত্রভাবে ইসলামসম্মত হওয়ার মতো পরিস্থিতিতেও সর্বোপরি বিষয়টি ইসলামবহির্ভূত হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়াল্লা বলছেন, “... তোমরা কি (তাহলে) আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং আরেক অংশ অবিশ্বাস করো?” (সূরা বাকারা ২:৮৫)

কোন ব্যক্তিবর্গের আভ্যন্তরীণভাবে ইসলামের কোনো বিশেষ বিষয়ে সঠিক মত হিসেবে নিতে হবে, সে সম্পর্কে ইসলামে পরিষ্কার ভাষায় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন, “আমার পর তোমাদের মধ্যে লোকেরা শীঘ্রই নানা মতানৈক্য

দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নত এবং সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের রীতিনীতি দাঁতে কামড়ে ধরার মতো করে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে নতুন কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।” (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমীযী ও ইবনে মাজাহ সূত্রে মেশকাত শরীফে বর্ণিত ১৫৮ নং হাদীস)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন, “আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যে পর্যন্ত তোমরা এ দুটি মজবুতভাবে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পথ হারাবে না। এ দুটি হলো কোরআন ও সুন্নাহ।” (মুয়াত্তা সূত্রে মেশকাত শরীফে বর্ণিত ১৭৭ নং হাদীস)

ইসলাম অনুসরণ করার ব্যাপারে বহুত্ব শুধু নয়, বৈপরিত্যও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমভাবে অনুমোদিত। সফরে রোজা রাখা না রাখা, বনু কুরাইযাতে পৌঁছতে গিয়ে এক দল কর্তৃক আসরের নামাজ পথিমধ্যে পড়া এবং আরেক দল কর্তৃক কাযা করা, অবরোধ চলাকালীন শত্রুপক্ষের ফলবান খেজুর গাছ কাটা বা না কাটা ইত্যাদি এর উদাহরণ। ইসলামে ব্যাখ্যাগত বৈচিত্র্য দেখা যায় শরীয়াহর ক্ষেত্রে। কিন্তু আকীদার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আকীদাগত তথা ফিলোসফিক্যাল আসপেক্টে ইসলাম কোনো প্রকার সমঝোতা অনুমোদন করে না। বলা যায়, এই একটি ক্ষেত্রে ইসলাম সাদা-কালো নীতি অনুসরণ করে। এমনকি আন্তিকতার কেবল একটি সুনির্দিষ্ট ভাষ্যকেই ইসলাম অনুমোদন করে।

“নিশ্চয়, আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম” অথবা, “তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করো না”- এ ধরনের আয়াতসমূহের তাৎপর্য খুবই পরিষ্কার। আমলের ক্ষেত্রে অপারগ পরিস্থিতিতে কমবেশি করার অনুমোদন থাকলেও ইসলামের আকীদা তথা ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এর অনুমোদন নাই। ইসলামের ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিজের মতো করে নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নাই। উপরের হাদীসগুলো ভালো করে পড়লে দেখা যাবে আল্লাহর রাসূল (সা) যেভাবে বলেছেন ও সাহাবাগণ যেভাবে বুঝেছেন- তার বাইরে গিয়ে ইসলামের কোনো ‘ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং’ হাজির করার এখতিয়ার ইসলাম কাউকে দেয় না।

“একবার হযরত ওমর (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমরা ইহুদীদের নিকট তাদের বহু ঘটনা শুনে থাকি, যা অত্যন্ত চমৎকার মনে হয়। তার কিছু লিখে রাখতে আপনি আমাদের অনুমতি দেবেন কি?’ রাসূল (সা) জবাব দিলেন, ‘ইহুদী-খৃস্টানদের মতো তোমরাও কি দ্বীনের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দ্বীন নিয়ে এসেছি। হযরত মুসাও (আ) যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁকেও আমাকে অনুসরণ করতে হতো।’ (মেশকাত শরীফে বর্ণিত ১৬৮ নং হাদীস)

এই হাদীস অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলামের উৎস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। দর্শন তো দূরের কথা, অন্য ধর্মের কোনো গ্রন্থকেও প্রাইমারি সোর্স হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

ইসলামে দর্শনের পরিসর

তাহলে আগের সেই কথা আবার এসে যায়— ইসলামে দর্শন চর্চার সুযোগ কিম্বা পরিসর কী? বুদ্ধিগত জ্ঞানকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে যেমন বুদ্ধিবাদ চর্চা হয়ে আসছে, অভিজ্ঞতাকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে যেমন অভিজ্ঞতাবাদের সব তত্ত্ব চর্চা হয়ে আসছে; তেমনিভাবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অনুকূলে ইসলামী দর্শন চর্চা সম্ভব। এর বাইরে ‘ইসলাম’-এর বিষয় নিয়ে দর্শন চর্চা হতে পারে। তবে তা ইসলামসম্মত নয়। যদিও তা জানাটা ইসলামের ভেতরকার অবস্থান থেকে (ইসলামী) দর্শন চর্চার জন্য অপরিহার্য। উল্লেখ্য, অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার মতো মূল শাখাসমূহ ব্যতিরেকে দর্শনের অপরাপর সব শাখা ‘philosophy of something’ প্যাটার্নে পরিচিত, পঠিত ও চর্চিত হয়। যেমন, philosophy of language ইত্যাদি। এভাবে ইসলামী দর্শনও দর্শনেরই একটি শাখা বিশেষ। দর্শনের প্রচলিত বিষয়বস্তুর কোনোটিই ইসলামী দর্শনের আওতাবহির্ভূত নয়।

ইসলাম সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক গ্রন্থসমূহ তথা কোরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত মূল পরিভাষা হচ্ছে ‘দীন’। দীন অভিন্ন ও অবিভাজ্য। বাংলায় সাধারণত দীনকে ‘ধর্ম’ হিসেবে অনুবাদ করা হয়, আর ইংরেজিতে religion। ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা— এগুলো আমাদের বলা বা উপস্থাপনাগত ব্যাপার। ইসলামের ভেতর থেকে ইসলাম একটি দীন। কেউ মানুষ বা না মানুষ কিংবা আংশিক মানুষ, অথবা ‘আদ-দীন’-এর কিছু কিছু বিষয় নিয়ে কোনো ককটেল বানাক, সেটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপার। দীন হিসেবে ইসলাম প্রথমত ধর্ম, এরপর দর্শন বা আর যা কিছু। ইসলামের দিক থেকে ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মোকাবেলায় দার্শনিক ব্যাখ্যা তাই গ্রহণযোগ্য নয়। উপরে উল্লিখিত কোরআন এবং হাদীসের উদ্ধৃতিসমূহ এ বিষয়কে নিশ্চিত করে। অবশ্য ইসলামের ওপর যারা স্বীয় মর্জি-মোতাবেক একটি ব্যাখ্যা চাপিয়ে দর্শনের নামে একে লেজিটিমেট করতে চাইবেন, তারা উপরোল্লিখিত সুস্পষ্ট ও স্বব্যাখ্যাত সূত্রগুলোসহ এ ধরনের তাবৎ দলীল-প্রমাণকে নিছক ‘ধর্মতাত্ত্বিক’ হিসেবে নাকচ করে দেয়ার ‘অধিকার’ (?) রাখেন!

ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় প্রচেষ্টা কি আদৌ নিরপেক্ষ?

ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়ের কথা যারা বলেছেন, তারা ধর্মের ওপর দর্শনকে চাপিয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে ধর্মকে নাকচ করেছেন। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ স্পষ্টত ধর্মবিরোধী। অজ্ঞেয়বাদ ও নির্বিকারবাদ যেমন মূলত নাস্তিকতাবাদ, তেমনি যারা ধর্মকে ফিলোসোফাইজ করতে চান, ধর্মের রেফারেন্সমুক্ত ইন্টারপ্রিটেশন দাঁড় করাতে চান

তারা আদতে ধর্মেরই গোড়া কাটার লোক। ধর্মের সমর্থনে যদি দর্শন হতে না পারে, তাহলে আল-গাজ্জালীকে দার্শনিক গণ্য করাটা আগাগোড়াই ভুল। স্মরণ করা যেতে পারে, মুসলিম দর্শনের দুনিয়াজোড়া সব পাঠক-পণ্ডিতই মনে করেন, আবু হামিদ আল-গাযালী হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক।

যাহোক, ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় প্রচেষ্টার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে ইবনে রুশদের নামটি সবার উপরে ভেসে উঠে। তিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলের অনুসারী। অ্যারিস্টটল দার্শনিক আলোচনা অনুধাবনের সক্ষমতা-অক্ষমতার নিরিখে মানুষকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। অ্যারিস্টটলের শিক্ষক প্লেটো তার কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। বিশিষ্ট peripatetic (pro-Greek) দার্শনিক হিসেবে ইবনে রুশদও নাগরিকদেরকে জ্ঞানগত তারতম্যের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—

- ১। আলঙ্কারিক (rhetoric) পদ্ধতি— জনসাধারণের পদ্ধতি
- ২। যুক্তিসিদ্ধ (dialectical) পদ্ধতি— ধর্মতাত্ত্বিকদের পদ্ধতি
- ৩। প্রতিপাদক (demonstrative) পদ্ধতি— দার্শনিকদের পদ্ধতি।

‘দার্শনিকদের জন্য আলাদা ও সর্বোচ্চ মর্যাদা’— এই পদ্ধতির দলীল হিসেবে তিনি উপরে উদ্ধৃত সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতকে একটি মৌলিক পরিবর্তনসহ উল্লেখ করেন। উক্ত আয়াতে ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না’ এরপর একটি ওয়াকফে লা’যেম (অত্যাবশ্যকীয় বিরতি চিহ্ন) রয়েছে। দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত কোরআনের সকল কপিতেই এটি রয়েছে। কিন্তু ইবনে রুশদের প্রস্তাবনায় এই ওয়াকফে লা’যেম চিহ্নটি হবে ‘আর যারা গভীর জ্ঞানী’ এর পরে। তাতে করে আয়াতটির পাঠ দাঁড়ায় এমন: ‘আল্লাহ এবং যারা গভীর জ্ঞানী, তারা ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।’

ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিকল্প হিসেবে ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে ইবনে রুশদের এই ব্যাখ্যাও মেনে নিতে হয়! মানুষের মধ্যে জ্ঞানগত পার্থক্য কি নাই? যদি থাকে তাহলে একে ভিত্তি ধরে মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ কয় ধরনের হতে পারে? এসব প্রশ্ন তৈরি হওয়া যতটা স্বাভাবিক, এর উত্তরও ততটাই সহজ। জ্ঞানগত দিক থেকে মানুষে মানুষে বেশকম হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এ বিষয়টি সঠিক হওয়া সত্ত্বেও এর ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণীবিভাসকরণ ভুল।

জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে তিন বা চার ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা চার, পাঁচ, ছয়, সাত ইত্যাদি অনেক ভাগেই ভাগ (category) করা সম্ভব। তবে এই বিভাজন ও প্রত্যেক গ্রুপের নিজেদের মতো করে টেক্সট ব্যাখ্যার বৈধতা থাকলে ইসলাম বা অনুরূপ তাৎপর্যপূর্ণ কোনো বিষয়েরই স্বাভাবিক ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে না। এ বিষয়ে

অর্থাৎ ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যের সাথে ব্যাখ্যার বৈপরিত্যের পার্থক্য প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের জ্ঞানগত পার্থক্যকে ইসলাম বাস্তবসম্মত মনে করে। কোরআন ও হাদীসের প্রচুর রেফারেন্স রয়েছে যাতে জ্ঞান, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানীর উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানগত দিক থেকে মানুষ দুই ধরনের: যারা জানে আর যারা জানে না। যারা জানে না, তাদের দায়িত্ব হলো যারা জানে তাদের কাছ হতে জেনে নেয়া। কে জানে আর কে জানে না, তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। অতএব, এমনও হয় কিম্বা হতে পারে— কেউ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্যদের তুলনায় বেশি জানে। অথচ একই ব্যক্তি অন্য কোনো বিষয়ে কম জানে।

অতএব, কে বেশি জানে আর কে কম জানে তা জানার কোনো বিষয় ও প্রেক্ষাপট নিরপেক্ষ পদ্ধতি নাই। মানুষের জ্ঞানগত মর্যাদা নিরূপণের বিষয়ে ইসলাম অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ (objective)। যিনি (বেশি) জানেন তিনি স্বীয় জ্ঞানের দাবি অনুসারে কাজ করবেন বা করতে চাইবেন। সংশ্লিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতিই প্রমাণ করবে, তার উক্ত দাবি সঠিক কিনা বা কতটুকু সঠিক। আলেমে দ্বীন, ফকীহ, মুজতাহিদ ইত্যাদি মর্যাদাপূর্ণ শব্দাবলীর মাধ্যমে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে ইসলামের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য রচনার অধিকার (authority) বুঝায় না। এগুলো বরং কিছু ব্যক্তির জ্ঞানগত আধিক্য ও পরিশুদ্ধিকে নির্দেশ করে মাত্র।

১৩ ডিসেম্বর, ২০১৪

<https://cscsbd.com/890>

ফিলোসফিতে পড়ো? তোমাকেই বলছি, শোনো...

চাই, ফিলোসফি হোক সেরা
জ্ঞানে, গুণে, গণ পরিচয়ে।
চাই, সেরা সাবজেক্ট হতে
বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে
একাডেমিক এক্সট্রা-একাডেমিক সব
সাংবাৎসরিক কর্মকাণ্ডে।
ফিলোসফি ফ্যামিলি হোক
সবার ঈর্ষার, ভালো লাগার
আকর্ষণের শীর্ষে।
চাইলেই আমরা এ ধরনের অবস্থান
তৈরি করতে পারি;
দরকার শুধু ইচ্ছা, একাগ্রতা ও
ঐক্যবদ্ধতার।

নিজেদের সেরা প্রমাণে আগ্রহী
এমন আছো কারা?
চলো হাত তুলি
শপথ নেই এগিয়ে চলার।
হীনমন্যতার সব জড়তা ভেঙে
জীবনের রহস্য সন্ধান
মননশীলতার মূর্তপ্রতীক হয়ে
সত্যসন্ধানী হতে চাও কারা,
আসো, একসাথ হই।

জ্ঞানকাণ্ডের মূল অংশের মালিকানা
তোমার।

অথচ, তুমি হীনমন্য; কেন?
পরিচয় দিতে সংকোচবোধ করো;
কেন?
আমি ফিলোসফির ছাত্র
এ আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন।
যত সব ভ্রান্তির মাঝেও
নির্ঘাত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম,
আমি ফিলোসফিতে ভর্তি হয়েছিলাম।
মুক্ত জ্ঞানের এই অবাধ প্রেম
দিনে দিনে গাঢ় হয়েছে; বরং বেড়েছে
এই মুগ্ধতা যেন অনিশেষ।

হ্যাঁ, আমি ফিলোসফির স্টুডেন্ট-
এ আমার গর্বের বিষয়
বলার মতো পরিচয়।
মাথা উঁচু করে প্রবল বিশ্বাসে এসো বলি,
আমি ফিলোসফির স্টুডেন্ট ...।
তুমি যদি চাও, আমি যদি চাই
যদি এক ঐক্যবদ্ধ ‘আমরা’ গড়ে
তুলতে পারি,
নির্ঘাত জানি,
জ্ঞানে, গুণে ও গণ-পরিচয়ে
খুব শীগগীরই আমরাই হবো সেরা;
শুধু সময়ের অপেক্ষা
সময়কে শুধু গড়ে নেয়ার বাকি
শুধু তেমন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দেরি।

কবিতাটির আবৃত্তি শুনতে নিচের লিংক ভিজিট করুন:

https://www.youtube.com/watch?v=3WsJNhU7_G8



অথবা, পাশের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Sayed Towhidul Alam: স্যার, ফিজিক্স, রসায়ন ইত্যাদি জ্ঞানের সব শাখাই তো ফিলোসফির অন্তর্ভুক্ত। তাহলে আবার আলাদা করে ফিলোসফি একটা সাবজেক্ট কেন হলো? আর ফিলোসোফি পড়ার জন্য আলাদা নির্দিষ্ট বিষয়ই (যেমন: যুক্তিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব ইত্যাদি) বা কেন সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হলো এবং অন্যান্য বিষয়গুলো কেন নয়?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জ্ঞানের সব শাখা ফিলোসফির অন্তর্ভুক্ত নয়। একসময় ছিল। ফিলোসফি এখন আলাদা ডিসিপ্লিন। অন্যান্য সব জ্ঞানকাণ্ডের মতো ফিলোসফির মধ্যেও আছে বিভিন্ন সাব-ডিসিপ্লিন। যেমন, অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ইত্যাদি।

একসময় জ্ঞানের সবগুলো শাখা প্রত্যক্ষভাবে ফিলোসফির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন করে প্রাপ্তবয়স্ক বা বড় হওয়ার আগে সন্তানেরা থাকে মা-বাবার পরিবারে সদস্য। প্রজনন ক্ষমতাকে বেইজ হিসেবে ধরে আমরা নানা ধরনের সক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ণয় করি, সন্তানটি এখন নিজের পরিবার গঠন করা বা সংসার করার উপযুক্ত হয়েছে কিনা।

একইভাবে, কিছু সলিড ফাইন্ডিংসের ভিত্তিতে এক ধরনের জ্ঞানচর্চা যখন নিজস্ব আঙ্গিকে সত্যানুসন্ধানের কাজে সক্ষম হয়ে উঠে, তখন সেটাকে আমরা একটা স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি।

এই দৃষ্টিতে, অন্যান্য ডিসিপ্লিনের যে মূল শাখা, তা গড়ে উঠেছে ফিলোসফি চর্চার উপজাত বা বাই-প্রডাক্ট হিসেবে। যেমন, প্রকৌশলবিদ্যা, ট্রিপল-ই, সিএসই, এস্ট্রোফিজিক্স, এরোনটিকস, ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনার ভিত্তি হচ্ছে ফিজিক্স। আর ফিজিক্স হলো ফিলোসফির কন্ট্রিবিউশন। আজকালকার সব সাবজেক্টই ফিলোসফি চর্চার পরিণতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। এ জন্য দেখা যায়, নিউটনের ফিজিক্স সংক্রান্ত বইয়ের শিরোনাম হচ্ছে, Mathematical Principles of Natural Philosophy।

অপরদিকে, কোনো সাবজেক্টের অধীনে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণার যে চৌহদ্দি বা সীমানা, সেই সাবজেক্টের গভীরতর অধ্যয়নের মাধ্যমে একজন গবেষক সেই চৌহদ্দি বা সীমানাকে ছুঁয়ে যায় বা অতিক্রম করার পর্যায়ে এসে পড়ে। নিদিষ্ট ডিসিপ্লিনের কিছু ধরাবাঁধা বিষয় নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও একজন সিরিয়াস গবেষক এক পর্যায়ে এমন স্তরে উপনীত হয়, যা তার প্রারম্ভিক স্তরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করে। এবং এর ফলে তিনি জ্ঞানের বৃহত্তর নতুন ক্ষেত্রের মুখোমুখি হয়ে পড়েন।

বলাবাহুল্য, জ্ঞানের এই ‘বৃহত্তর ক্ষেত্র’টিই হলো ফিলোসফি। এজন্য যে কোনো সাবজেক্ট হতে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করলে আনুষ্ঠানিকভাবে সেটাকে বলে Doctor of Philosophy, সংক্ষেপে PhD।

মজার ব্যাপার হলো, অন্য ডিসিপ্লিনের একজন গবেষক ফিলোসফির এই বৃহত্তর আঙ্গিনায় এসে পড়েন নিজের সাবজেক্টের অন্তর্গত সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে। গবেষণার কোয়ালিটি বা ইনটেলিজেন্সিকে বাড়ানোর জন্য কোয়ালিটি বা এক্সটেনশনকে কমানো হলো উচ্চতর গবেষণার অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে তাই বিষয়বস্তুকে যথাসম্ভব ছোট করে নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর ফোকাস করতে হয়। দূরবীণ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে টিউবের মধ্যে লেন্স বসানোর মতো। প্যারাডক্সিক্যালি, গবেষণার বিষয় হয় যত সুনির্দিষ্ট বা ছোট, ফাইন্ডিংস হয় তত ব্যাপকতর ও মৌলিক।

বলাবাহুল্য, যে গবেষণায় জীবন ও জগতের মৌলিক তথ্য ব্যাপকতর সত্যকে উদঘাটন করা যায়, বা ‘সত্যের’ অধিকতর নিকটে যাওয়া যায়, সেই ধরনের গবেষণা হলো মূলত ফিলোসফি চর্চা। হতে পারে, ফিলোসফিতে জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে গবেষক সচেতন নন।

সংক্ষেপে বললে, যে কোনো ফিল্ডে সিরিয়াস স্টাডির এক পর্যায়ে আমরা জীবন ও জগতের বৃহত্তর সত্য বা সত্যতা সম্পর্কিত বিশেষ কোনো সংকটের মুখোমুখি হই। ফিলোসফির কাজ হলো এই ধরনের বিগ কোয়েশনগুলোকে প্রপারলি এন্ড সিস্টেমেটিক্যালি ডিল করা।

তোমাকে খুব স্নেহ করি। তাই একটু ব্যাখ্যা করে বললাম। ভাল থাকো। মহাকাশবিদ্যা নিয়ে তোমার কৌতূহল ও অধ্যয়ন অব্যাহত আছে, আশা করি।

শামস আরা নওরোজী: রেজাল্টের ভিত্তিতে যখন বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারটি সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন আমার মধ্যে হীনমন্যতা কাজ করছিলো প্রচন্ড রকম। যেখানে আমার সহপাঠীরা ইংরেজি, বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণসহ বিবিধ বিষয়ে ভর্তি হয়ে গেলো; তখন একটা হীনমন্যতা আমাকে ঘিরে ধরেছিল। ভেবেছিলাম কী হবে দর্শন পড়ে? কী হবে অন্যের মতবাদকে ধারণ করে? কিন্তু যখন দর্শনের পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করলাম, তখন দেখলাম এ এক গভীরতায় আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন এক গভীর জ্ঞানে অবগাহন করছি। জীবনের মূল্যবোধকে মূল্যায়ন করতে শিখাচ্ছে। শিখাচ্ছে কীভাবে আধ্যাত্মিকতার জগত অতিক্রম করতে হয়। কীভাবে বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা করতে হয়। কীভাবে নিজের গণ্ডি পেরিয়ে ভ্রমণ করতে হয় মানবতায়।

হ্যাঁ, আজ সত্যিই গর্ব করে বলতে পারি, আমি দর্শনের ছাত্রী। মানপত্রের সামান্য কিছু নাম্বার আমাকে আজ বিশাল ভাঙারে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। হ্যাঁ, অনেকের কাছে আজ যা মহামূল্যবান; আমার কাছে তা অতি নগণ্য। আমি তাচ্ছিল্য করতে পারি, যা নিয়ে সংগঠিত হতে পারে মহাযুদ্ধ। হ্যাঁ, আজ আমার যে আত্মিক প্রাচুর্য, তা শুধুই আমার। হ্যাঁ, আজ সত্যিই আমি গর্বিত যে আমি দর্শনের ছাত্রী।

আজ আমার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে প্লেটো, এরিস্টটল, দেকার্ড, হেগেল, কার্ল মার্কস থেকে সুফিবাদের শামস তাবরীজ, মাওলানা রুমী, আব্বাস ইকবাল প্রমুখ। আজ আমি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারি।

কারণ, আমি দর্শনের ছাত্রী।

১৮ মে, ২০১৭

<https://dorshon.com/are-you-a-philosophy-student>

যুক্তির বাইরে কিছু নাই

নিত্য নতুন এই পুরনো পৃথিবীতে,
সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে
বেঁচে থাকার অপার আনন্দে
আমরা ঋদ্ধ, ধন্য।
স্মরণ করছি আজ প্রবল ভালোবাসায়,
সব সত্যপথ যাত্রীদের।
ঘোষণা করছি আমাদের অকপট একাত্মতা,
যুক্তিবাদী সব জ্ঞানীদের সাথে।

খণ্ডিত জ্ঞানের খোলস ছেড়ে
এসো বেরিয়ে পড়ি আজ,
মুক্ত জ্ঞানের সন্ধানে।
দুর্বল যুক্তির মায়াজাল ছিন্ন করে,
ঔদ্ধত্যের নির্বুদ্ধিতাকে অস্বীকার করে,
এসো খুঁজে নেই, ধারণ করি জীবনের
পূর্ণ সত্যকে।

এসো, প্রবল উদ্যমে হই সংগ্রামমুখর।
নিরলস ঐকান্তিকতা দিয়ে
গড়ে তুলি এক সুন্দর মানব জীবন।
এসো, বিশ্বাস করি,
যুক্তির বাইরে কিছু নাই।
হতে পারে না কাণ্ডজ্ঞানের
বিপরীত কোনো সত্য।

আমাদের পরিচয় হোক এমনই—
নীতির প্রশ্নে আমরা ক্ষমাহীন।

আমাদের মনোজগতে নাই
সত্যের কোনো বিকল্প।
ভাবতে পারি না আমরা
ন্যায়ের কিছুমাত্র অন্যথা।
বুদ্ধির অনুকূলে আমরা
নিঃসঙ্কোচ, নির্ভয়, অবিচল সর্বদা।

কবিতাটির আবৃত্তি শুনতে নিচের লিংক ভিজিট করুন:

<https://www.youtube.com/watch?v=S8LEERu3A24>

অথবা, পাশের কিউআর কোড স্ক্যান করুন



[মোহাম্মদ আমীর মারুফের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ভিডিওটা তৈরি করে দেয়ার জন্য। আবৃত্তিটা আমি নিজেই রেকর্ড করেছিলাম দু’তিন দিন আগে। আমার ট্যাবে। কোনো মাইক্রোফোন ছাড়াই। এরপর টেক্সটসহ অডিওটা আমার পরিচিত বেশ কয়েকজনের কাছে ইনবক্স করেছিলাম। তারা ভালো বলাতে মারুফকে অনুরোধ করেছি একটা ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে দেওয়ার জন্য।

চিন্তাশীল প্রাণী হিসেবে একজন মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের পরিচয়, নৈতিক অবস্থান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত, তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’র মতো কবিতার আঙ্গিকে এটি আসলে মানবিক মর্যাদার একটি সর্বজনীন ঘোষণা। বিশেষ করে, আজকের ও আগামী দিনের জীবনবাদী সমাজকর্মীদের জন্য।]

এপ্রিল ৯, ২০১৯

<https://mozammelhq.com/theres-nothing-out-of-the-reason>

পোস্টার



PHILOSOPHY

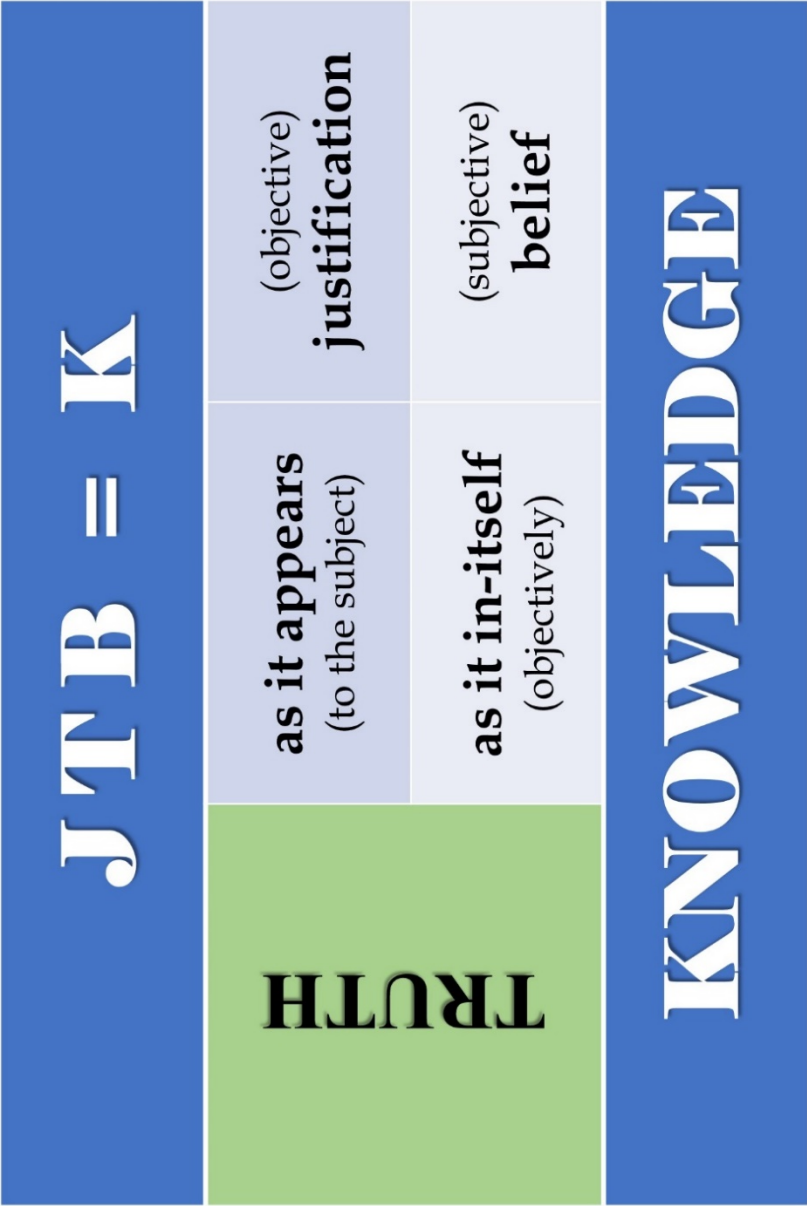
dorshon.com

JTB = K

‘knowledge is justified true belief’

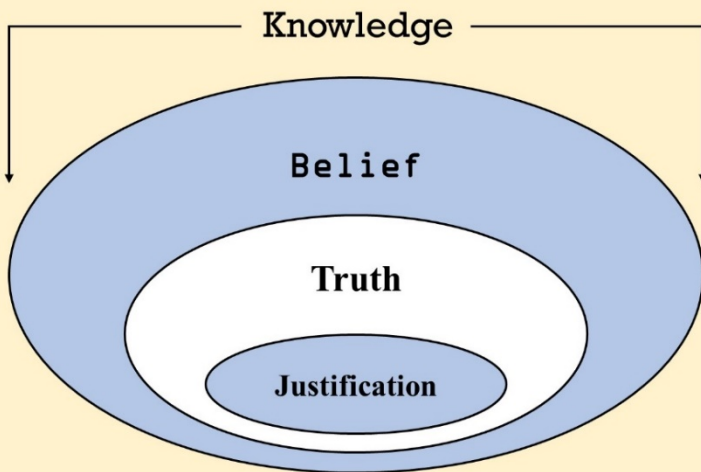
– Plato

dorshon.com



knowledge is a kind of belief
though
all beliefs are not knowledge

knowledge is those beliefs
that have truth & justification



dorshon.com

WHAT

How

Why

observation

argument

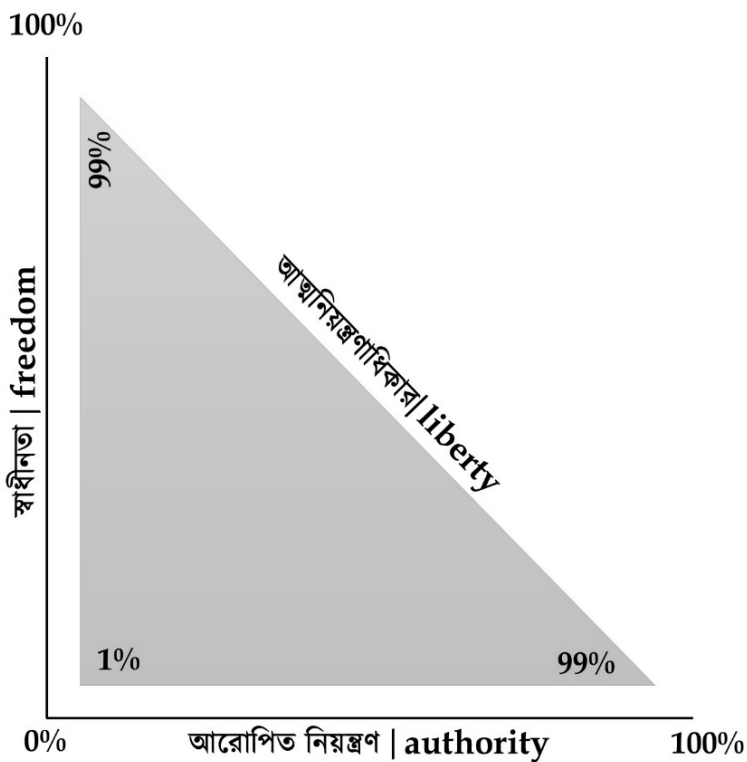
science

philosophy

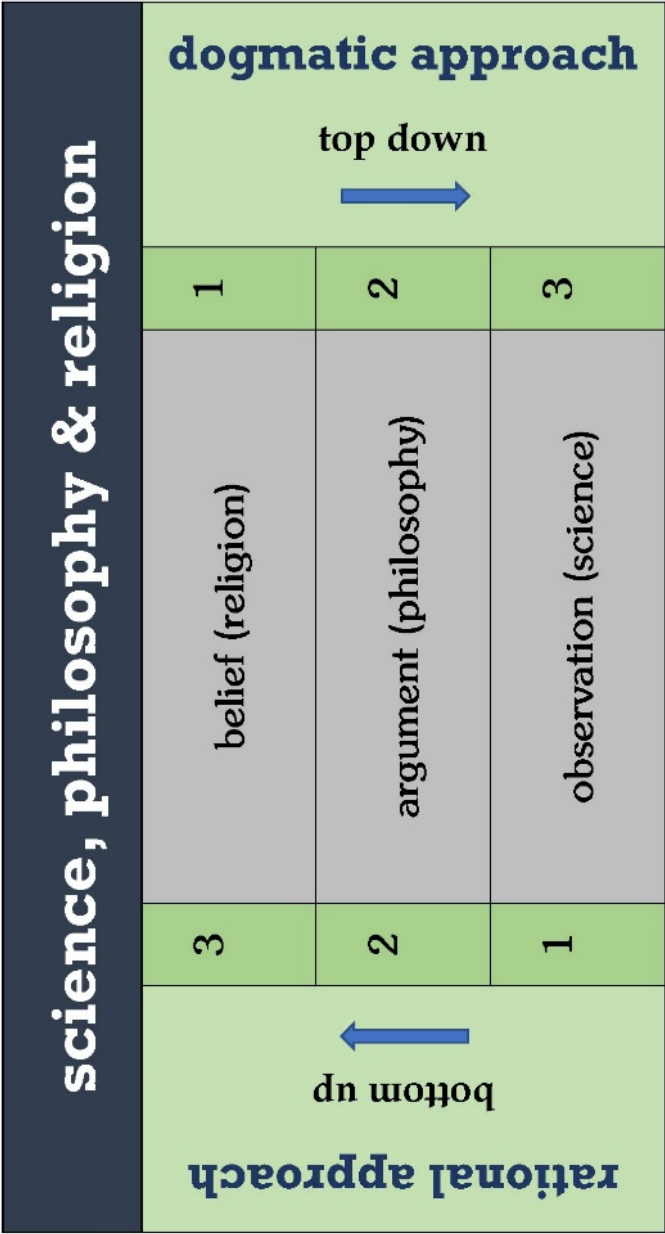
approaches of science & philosophy

অধীনতার মাঝে স্বাধীনতা

Freedom under Authority



dorshon.com





বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম

dorshon.com